

৯ঋকাল মুখপত্র | দ্বিতীয় সংখ্যা | ২০১৮

ভ্রমক

হরফনামা





প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা বইমেলা

প্রকাশক

সামরান হুদা

৯ঋকাল বুক্‌স

৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড (দ্বিতল), কলকাতা ৭০০ ০২৫

ফোন +৯১ ৯৭৪৮৭৪৭৪৮৭, +৯১ ৯০০৭২৭৫২৪৭

ইমেল lyriqal.books@gmail.com

www.lyriqalbooks.com

সম্পাদনা

বিকাশ গণ চৌধুরী

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ গ্রন্থাগার

১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা পত্রিকা

যখন ছাপাখানা এল, শ্রীপাঙ্ক, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

বাংলা বইয়ের গোড়ার কথা, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড

আঠারো শতকের গদ্য ইতিহাস ও সংকলন, গোলাম মুরশিদ, নয়্যা উদ্যোগ

কোমলগান্ধার, সুবীর রায়চৌধুরী সংখ্যা (প্রকাশিতব্য)

আঠারো শতকের বাংলা গদ্য চিঠিপত্রে কিছু নতুন প্রমাণ, দেবেশ রায়, প্যাপিরাস

নথিপত্রে লোকজীবন, শ্যামল বেরা, লোকায়ত

বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর, অতুল সুর, জিঞ্জাসা

হরফনামা কিউরেশন ও চিত্র সম্পাদনা

সুমেরু মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

হিরণ মিত্র

হরফ বিন্যাস

সুচরিতা করণ, ৩৮, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোড, হাওড়া ৪

মুদ্রক

এস পি কমিউনিকেশনস, ৩১ বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৯

দাম ৩০ টাকা



সম্পাদকীয়

আবার একটা নতুন বছর, আবার একটা নতুন বইমেলা, আবার একটা নতুন 'চমৎকার'। এবারের বিষয় 'বাংলা হরফ', থাকছে তা নিয়ে গোটা পঁচেক লেখা, গোটা পঁচেক বললাম বটে তবে সবক'টাই যে ঠিক গোটা লেখা তা নয়, গোটা লেখার পাশাপাশি আছে কয়েকটা লেখার অংশ বিশেষ। আমি হরফ বিশেষজ্ঞ নই, তবে হরফের রকমফের নিয়ে ওয়াকিবহাল, তাই আমার পড়া একটু ভাগ করে নেওয়া এই আর কি! এর পর কেউ হয়তো খুঁজে পেতে আরও পড়বেন, তখন আমরা তার কাছ থেকে আরও কিছু জেনে নেব, চাই কি প্রকাশ করে ফেলব বাংলা হরফ নিয়ে তার লেখা আস্ত একখানা বই; সে স্বপ্ন বাতাসে উড়ুক...

এখানে প্রথমে আমরা একটু ছোট করে ছাপার জন্য তৈরি বাংলা হরফের উৎপত্তির ইতিহাসটা জেনে নেব, তার পর দেখে নেব প্রথম দিককার কিছু ছাপার জন্য তৈরি বাংলা হরফের নমুনা, জেনে নেব কাঠ কেটে বা ধাতু খোদাই করে ছাপার জন্য বাংলা হরফ তৈরি করার সমস্যাও; রোমান হরফের ক্ষেত্রে যেখানে ৬০ থেকে ৭০-টা অক্ষরেই ছাপার চাহিদা মেটে সেখানে বাংলা ছাপার ক্ষেত্রে অক্ষর, যুক্তাক্ষর, মাত্রায়ুক্ত অক্ষর এসব নিয়ে প্রয়োজন হয় প্রায় ছ'শো অক্ষরের। তাই রোমান হরফের নানান রূপবৈচিত্র্য থাকলেও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেটা চাহিদা সত্ত্বেও তুলনায় অত্যন্তই কম। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে অবশ্য সমস্যা এখন অনেকটাই কম, বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির কারণে এখন নানান রূপের 'বাংলা হরফ' তৈরি করা সম্ভব, যদিও বাংলায় তা আমরা অতি অল্পই করে উঠতে পেরেছি। প্রায়শই আমাদের তৈরি করা এক ধরনের 'বাংলা হরফ' এক ধরনের নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেমে নির্দিষ্ট একটি সফট-ওয়্যারেই কাজ করে, সেটার সর্বজনমান্য কোনও পদ্ধতি নেই। অতীত দুঃখের কথা এই যে আমরা চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে কিংবা আরও দূরের মহাকাশে পৌঁছে যেতে পারলেও আজও তিরিশ কোটি বাঙালির জন্য কম্পিউটারে বাংলা ভাষায় (যা পৃথিবীর পঞ্চম/ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যবহারিক ভাষা) কাজ করার কোনও অপারেটিং সিস্টেম নেই, যদিও বাইশ/চব্বিশ লাখ লোকের ব্যবহৃত ভাষায়ও কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করা যায়।

বই প্রকাশের সময় আমরা যেমন বইয়ের আয়তন, কাগজের ওজন ও রং, পৃষ্ঠানির প্রকারভেদ, বাঁধাই ইত্যাদি নিয়ে ভাবি, তেমনি বইয়ের বিষয়ের গাভীর্য অনুযায়ী তার হরফের রকমফের নিয়েও ভাবি, এবং বলতে কি, সেরকম ভেবেই গ্রন্থনির্মাণ করা সঙ্গত, কিন্তু অপ্রাপ্যতার কারণে আমাদের কয়েকটি চালু হরফের মধ্যেই ঘোরা ফেরা করতে হয়; তা হরফ নিয়ে আমাদের চেতনা যদি একটু বাড়ে, আমরা যদি বাংলা হরফ নিয়ে আরও একটু সৃষ্টিশীল হবার চেষ্টা করি তো আমাদের এই ভাবনা ভাবাভাবির ভাগাভাগি কাজে লাগে; পাঠক, প্রকাশক, বৈজ্ঞানিক, উদ্ভাবক আপনারা এ বিষয়ে ভাবুন, আমরা চাই নানান রকমের বাংলা হরফে বাংলা ভাষার বই-পত্র (বৈদ্যুতিন বই-ও) সেজে উঠুক, সৃষ্টিশীলতার পথে আমরা আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাই...

আগের সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও ৯ম্বকালের নতুন পুরনো সব বইয়ের খবর থাকছে, থাকছে সেগুলো সংগ্রহ করার নানান সুলুক-সন্ধানও; আপনারাদের আমরা আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই বছরও ৯ম্বকাল বুকস বিজ্ঞাপনের পিছনে একটি টাকাও খরচা করেনি, বই প্রকাশের ব্যাপারে আমরা যত্নশীল, প্রতিটি বইতে সম্পাদক ও শিল্প নির্দেশক কাজ করেন। বইগুলি ডিজাইন সমৃদ্ধ। প্রোডাকশন মান আন্তর্জাতিক। সুতরাং আপনারাই ভরসা, আপনার ভাল লাগলে ছড়িয়ে দিন খবর। সব বই বই নয়, কিছু কিছু বই।

বিকাশ গণ চৌধুরী

বোধপূকাশ° শব্দশাস্ত্ৰ°
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থ°
শ্রুযতে হালেদগ্জেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE

BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি মন্যাত° নয়যুঃ শব্দবারিষেঃ।
পুঙ্খিয়ান্তস্য কুৎসন্য ছমোবকু° নরঃ কথ°॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হলহেড-এর ব্যাকরণের নামপত্র প্রকাশকাল ১৭৭৬, হুগলী

সূচিপত্র

বাংলার ছাপার হরফের জন্মকথা - ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭

বাংলার ছাপার হরফ - চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১

বাঙ্গলা মুদ্রাক্ষণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন - যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫

বাংলা হরফের তিন দশা - সুবীর রায়চৌধুরী ৩১

আঠারো শতকের হাতের লেখা - গোলাম মুরশিদ ৩৭

কোনরক্ষণম বিপর্যয়ম্। মেবম বিম্ববসব করিবে নিশ্চয় ॥ আর মুতহরচার অতিবড়হীশ। রম
কিছনাহিবাকি অতিপ্রবীণ ॥ শ্রীগুরু বিম্বব পাদপদ্মে করিআস। এরমকরিকা নন্দকিণোর
পূকাশ ॥ ১ ॥ ইতিপ্রীরন কনিকামে সন্তোশারীনারবরন নাম শোভষদন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥
নমাপ্তয় বসক নিবশ্রুত ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ স্বাগুরামিদং গ্রহিষ্ণদাসনচ মোকাম শ্রীশ্রী ৭ ধাম ॥ ৮ ॥
পঠনার্মদ্বী যুক্তনবকৃষ্ণবনু মুননী শাকিম কাছ্যাম ॥ ইতি নিন ১২৩৬ নেনে গেরিম ২০ ৩৫

সম্বৎ ১৮৮৯। মাহতাহ্রসুদীনবমী বোজ নোমবার : কৃষ্ণকৃষ্ণে কুটিতে বশিয়া পুস্তকবিনামময় ॥
১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

১০৫ শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নেতৃত্ব গায়

বাংলার ছাপার হরফের জন্মকথা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রসার মুদ্রায়ন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলিয়া এই সকল বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, মুদ্রায়ন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধেও সর্বদাই তাঁহাদের কৌতূহল দেখা গিয়াছে। এই কারণে ইউরোপে মুদ্রায়ন্ত্রের প্রবর্তন ও উন্নতির বিররণ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখিত হইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশে মুদ্রায়ন্ত্রের ইতিহাস সেইরূপ সুক্ষ্ণভাবে আলোচিত হইয়া নাই, এমন কি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন অনুসন্ধানও হয় নাই। ইহার ফলে বাংলা দেশে মুদ্রণ ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্তন সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ইউরোপে পৃথক হরফ সাজাইয়া মুদ্রণরীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কাঠের ব্লক হইতে পুস্তক ছাপা হইত। এই সকল ব্লকে পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না, একটি পৃষ্ঠা একসঙ্গে খোদাই করা হইত। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন, বাংলা দেশেও প্রথমে কাঠের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াইছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধারণা ভুল। এদেশে ছাপা ও ছাপার অক্ষরের প্রবর্তন করেন ইংরেজরা। সুতরাং যে-সময়ে উহার প্রবর্তন হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে ছাপার রীতি ও পদ্ধতি যেরূপ ছিল, সেই রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা হরফ ও ছাপার উৎপত্তি হয়। এদেশের লোক যদি নিজের বুদ্ধিতে নূতন করিয়া মুদ্রণপদ্ধতি আবিষ্কার করিত তাহা হইলে হয়ত ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবার কারণ থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া বাংলা দেশে একেবারে প্রথম হইতেই পৃথক সীসার টাইপ হইতে মুদ্রণরীতি প্রচলিত হয়।

বাংলা দেশে মুদ্রায়ন্ত্রের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান—ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত A Grammar of the Bengal Language পুস্তকে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা মুদ্রায়ন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত ইহা হইতেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরেজরা এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজনের বশে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গবর্নর-জেনারেল তখন ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই পুস্তক লিখিত হইবার পর প্রশ্ন উঠে বাংলা টাইপ ভিন্ন উহা কি করিয়া ছাপা যাইতে পারে? উহার পূর্বে উইলিয়াম বোল্টস্ বিলাতে এক প্রস্থ (ফাউন্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা একেবারে বিফল হয়। এই অবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংস চার্লস্ (পরে স্যর চার্লস্) উইল্কিন্স নামে কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ানকে বাংলা অক্ষরের ছেনি কাটিয়া দিতে অনুরোধ করেন। উইলকিন্স একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ওয়ারেন

হেষ্টিংসের উৎসাহে ভগবদ্দীতার ইংরেজী অনুনবাদ করিয়া ১৭৮৫ সনে প্রকাশ করেন, তৎপূর্বে কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। এদেশের ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার নানা বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ইতিপূর্বে শুধু নিজের খুশীতে বাংলা অক্ষরের দু-একটি ছেনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ওয়ারেন হেষ্টিংসের জানা ছিল বলিয়াই তিনি উইলকিন্সকে বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের সহিতও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এই কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার জন্য তিনি নিজের হাতে ছেনি কাটা, ঢালাই ও ছাপা প্রভৃতি সকল কাজ করেন। এই ভাবেই প্রথম বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্তন হয়।

দুই

বাংলা অক্ষর তৈয়ার করিতে প্রথম হইতেই উইকিন্সের সহকর্মী হয় একজন বাঙালী; তাহার নাম পঞ্চানন কৰ্মকার। উইলকিন্স স্বহস্তে তাহাকে অক্ষরের ছেনি কাটা শিখাইছিলেন। এই পঞ্চাননের কৰ্মপটুতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ সমসাময়িক বহু বিবরণে পাওয়া যায়। হালহেডের

ঐ	<i>a longum</i>	ম	<i>ma</i>	৫	<i>tha</i>	ঞ	<i>ka</i>
ঐ	<i>a breve</i>	ম্	<i>ma</i>	৬	<i>da</i>	ঞ্	<i>kha</i>
৳	<i>i breve</i>	র	<i>ra</i>	৭	<i>dha</i>	৳্	<i>gha</i>
৳	<i>y long</i>	৳	<i>ra</i>	৮	<i>ana</i>	৳	<i>ga</i>
৳	<i>y long</i>	৳	<i>la</i>	৯	<i>wa</i>	৳	<i>gha</i>
৳	<i>u breve</i>	৳	<i>oua</i>	১০	<i>toa</i>	৳	<i>oua</i>
৳	<i>u long</i>	৳	<i>sa</i>	১১	<i>thoa</i>	৳	<i>oua</i>
৳	<i>ra long</i>	৳	<i>ra long</i>	১২	<i>dora</i>	৳	<i>sa</i>
৳	<i>ra</i>	৳	<i>sha</i>	১৩	<i>dhoa</i>	৳	<i>sha</i>
৳	<i>ry</i>	৳	<i>sha</i>	১৪	<i>na</i>	৳	<i>sa</i>
৳	<i>li</i>	৳	<i>ha</i>	১৫	<i>pa</i>	৳	<i>ika</i>
৳	<i>ly</i>	৳	<i>tha</i>	১৬	<i>pha</i>	৳	<i>ika</i>
		৳	<i>oa</i>	১৭	<i>ya</i>	৳	<i>ika</i>
		৳	<i>bha</i>	১৮	<i>ya</i>	৳	<i>ika</i>

Alphabetum Brahm. III B.

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি



ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ঙ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ঙ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

স শ ষ ঠ ঙ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা

ব্যাকরণে যে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল, পঞ্চানন তাহা আরও সুন্দর একটি ফাউন্ট তৈয়ার করিয়াছিল। এই অক্ষরে ১৭৯৩ সনে কৰ্ণওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। অনেক দিন ধরিয়া এই টাইপটির চলন ছিল। পঞ্চাননের জন্যই টাইপ নির্মাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। মার্শম্যান তাঁহার বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, ১৭৯৮ সনের গোড়ায় পত্রিকাদিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে “দেশীয় ভাষায় ছাপার কার্য্য চালাইবার জন্য কলিকাতায় একটি অক্ষর ঢালাইয়ের কারখানা (letter foundry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;” স্যর চার্লস্ উইলকিন্সের নিকট শিক্ষিত লোকেরাই সেখানে ছেনি-কাটার কাজ করিত।

১৮০০ সনের গোড়ায় পঞ্চানন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করিতে আরম্ভ করে। কেরী তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

শত্ৰুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোটবহিতে পঞ্চগনন কি ভাবে কেৱী সাহেবের সহিত যুক্ত হয় তাহার উল্লেখ আছে। সংস্কৃতভাষাবিৎ বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব তখন পঞ্চগননকে ছেনি কাটার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পঞ্চগনন কলিকাতা গার্ডেনরীচে তাহার মনিবের বাসার কাছাকাছি অবস্থান করিত। কেৱী শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কাজের জন্য বারম্বার কোলব্রুকের নিকট পঞ্চগননকে প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হন, পঞ্চগননের নিকট লিখিয়াও কোন ফল হয় না। কেৱী সাহেব তখন এক হীন কৌশলের আশ্রয় লন, গোপনে গোপনে পঞ্চগননকে অধিক মাহিনার লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়া কেৱী কোলব্রুককে মাত্র দুই-চারি দিনের জন্য কাছে রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া পঞ্চগননকে লইয়া যান। কোলব্রুকের অনুনমতি ছাড়া পঞ্চগননের যাওয়ার উপায় ছিল না কারণ কেৱীর ভয়ে তিনি তাহার উপর কড়া পাহারা বসাইয়াছিলেন। পাদরি সাহেবের কথায় ডুলিয়া কোলব্রুক পঞ্চগননকে ধার দিলেন বটে কিন্তু তাহাকে আর ফিরিয়া পান নাই। ভিতরে ভিতরে ডেনিশ-সরকারের অনুমোদনে কেৱী পঞ্চগনন কৰ্ম্মকারকে শ্রীরামপুরে আটক করিয়া ফেলিলেন, অবশ্য পঞ্চগননের একেবারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নহে। পঞ্চগনন কোলব্রুককে লিখিলেন তাহাকে আটক করা হইয়াছে। কোলব্রুক এই ব্যাপার লইয়া একটা সোরগোল তুলিলেন। ইংরেজ সরকারের দাবীতেও ডেনিশ-গবর্নমেন্ট চলিলেন না। ব্যাপারটা না-কি শেষে বিলাত পর্যন্ত গড়াইয়াছিল, তাহাতে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কেৱীর যুক্তি ছিল এই যে পঞ্চগননের মত ভারতবর্ষের একমাত্র খোদাইকারক কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না।

এই ঘটনা সত্য হইলে তখনকার দিনে ছেনি কাটার কাজে পঞ্চগননের কি দাম ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। কেৱী অবিলম্বে পঞ্চগননকে নাগরী অক্ষরের একটি ফাউন্ট রচনায় নিযুক্ত করিলেন। দেবনাগরে বহু যুক্তাক্ষর থাকায় সাত শত ছেনির প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৮০৩ সনের গোড়ায় এই কাজ প্রায় অর্দ্ধেকটা থাকায় অগ্রসর হয়। কাজটি সত্ত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য মনোহর নামে একজন কৰ্ম্মপটু যুবককে পঞ্চগননের সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই মনোহর পঞ্চগননের জামাতা। এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পঞ্চগনন বাংলা অক্ষরের আরও একটি ফাউন্ট তৈয়ার করে। নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ যে-অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নূতন অক্ষর তাহা অপেক্ষা আকারে ছোট এবং দেখিতে আরও সুন্দর। ১৮০৩ সনে এই নূতন অক্ষরে নিউ টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীরামপুর মিশন পঞ্চগনন কৰ্ম্মকারকে পাইয়া শ্রীরামপুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রবেশ করিবার বৎসর-তিনেক (১৮০৩-০৪) পরে পঞ্চগননের মৃত্যু হয়।

ইহার পর বাংলা ছাপার হরফের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধানের যোগ্য। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে উহা সম্ভব নহে, কারণ ইহার বিষয়বস্তু বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা মাত্র।

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
 ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ
 ন প ফ ব ভ ম য র শ ষ
 স ষ শ ষ ষ
 ক ক ক ক ক ক
 ক ক ক ক ক ক

বাংলা বর্ণমালার নমুনা; A Code of Gentoo Laws, ১৭৭৬

করতেন। বাংলা বই ছাপার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি টাইপের নির্মাণের জন্য চেষ্টাও করেছেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উইলকিন্সের এই প্রচেষ্টার কথা জানা ছিল। তাঁর অনুরোধে উইলকিন্স হালহেডের ব্যাকরণের জন্য বাংলা টাইপ প্রস্তুত করতে সম্মত হন। প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন।

বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি ইম্পাতের উপর খোদাই করা কঠিন কাজ। নানা রকম আঁকাবাঁকা চিহ্ন, শূঁড়, যুক্তবর্ণ ইত্যাদি খোদাইয়ের কাজ বিশেষ কঠিন ছিল। প্রথম অসুবিধা উপযুক্ত প্রতিলিপির অভাব। যার জন্য জ্যাকসনের মতো অভিজ্ঞ টাইপ নির্মাতাও সফল হতে পারেন নি। উইলকিন্স নিজেই একাধারে ধাতুবিদ্যা বিশারদ, খোদাই করক, ঢালাইকর ও মুদ্রাকরের কাজ করেছেন। প্রথম উদ্যোগেই এরূপ সাফল্যের দৃষ্টান্ত বিরল।

হালহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয় হুগলীর সেন্ট অ্যান্ড্রুস প্রেসে। সেই থেকে উইলকিন্সের প্রধান কাজ হলো অক্ষর নির্মাণের কাজ তত্ত্বাবধান করা। প্রথম অ্যান্ড্রুজ প্রেসের সঙ্গে এবং পরে কোম্পানীর প্রেসের সঙ্গে আট নয় বছর যাবৎ যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় প্রেসটি থেকে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকানের এবং ১৭৯১ সালে এডমন্সটোনের গভর্নমেন্ট রেগুলেশনের বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়। সুতরাং উইলকিন্সের কৃতিত্ব ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত মুদ্রণের জন্য অল্প কয়েকটি অক্ষর নির্মাণে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বাংলায় বড় বই মুদ্রণের উপযোগী এক সাট বাংলা টাইপ তৈরী করেছিলেন। না হলে রেগুলেশন অনুবাদ সম্ভব হতো না।

বিশ্বকোষের প্রবন্ধাকার বলেছেন, উইলকিন্স নাকি কাঠের টাইপ তৈরী করেছিলেন। এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। তাঁর তৈরী টাইপ ছিল ধাতুনির্মিত। এইজন্য তিনি কর্মকার পধগননকে সহকারী করেছিলেন। কোনো কাঠের মিস্ত্রীকে নয়।

বাংলা অক্ষর ঢালাইয়ের ইতিহাসে পধগনন কর্মকারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। উইলকিন্স টাইপ নির্মাণের কৌশল যত্নের সঙ্গে পধগননকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পধগননের

শান্তাৰ বানৰ বনশকৰ শ

নিজের প্রতিভা না থাকলে এই শিক্ষাকে তিনি বাংলা মুদ্রণ প্রসারের জন্য প্রয়োগ করতে পারতেন না। উইলকিন্স দেশে চলে যাবার পরে পঞ্চননই অক্ষর নির্মাণ শিল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চনন হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন— এইটুকু ছাড়া তাঁর জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। উইলকিন্স ভারত ত্যাগ করবার পর পঞ্চনন বোধ হয় বাংলা টাইপ তৈরির ব্যবসা করেছেন। তারপর তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এইচ টি কোলব্রুকের জন্য এক সাট দেবনাগরী টাইপ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হন। উইলিয়াম কেবী শ্রীরামপুরে হরফ নির্মাণের কারখানা খোলবার সিদ্ধান্ত করে পঞ্চননকে আমন্ত্রণ জানান। পঞ্চনন শ্রীরামপুরে মাত্র তিন বছর কাড করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা টাইপের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন অনেকখানি। নিজের জামাতা মনোহরকে অক্ষরশিল্পের কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন বেশ ভালো করেই। মনোহর এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণ কর্মকার ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর মিশনেই কাজ করতেন। তাঁরা শুধু বাংলা নয়, ভারতের ও এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার টাইপও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করেছেন। বিদেশী অক্ষরনির্মাতাদের মূল্য অপেক্ষা শ্রীরামপুরে নির্মিত টাইপের দাম ছিল অনেক কম।

সুন্দর হরফ হস্তাক্ষরের উপর নির্ভরশীল। একথা কেবী বিশেষভাবেই উপলব্ধি করছিলেন। এই জন্য তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার কালিকুমার রায়ের হাতের লেখার নমুনা অনুসারে পঞ্চনন ও মনোহরকে দিয়ে এক সাট সুন্দর বাংলা অক্ষর তৈরী করিয়েছিলেন। মনোহরের অক্ষরনির্মাণ-কৌশল এতদিন পরেও যে খুব বেশী অগ্রসর হয়েছে তা কিন্তু বলা চলে না। যেটুকু উন্নতি হয়েছে তা যান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা, ফটোগ্রাফির সহায়তা ইত্যাদির জন্যই হয়েছে। টাইপ ফেস্ বা অক্ষরের আদলে বড় একটা বৈচিত্র্য আসেনি। অথচ সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে টাইপের আকারে ও আদলে বৈচিত্র্য প্রয়োজন। বাংলা টাইপের সেই বৈচিত্র্যের অভাব।

বাংলা হরফ মোটামুটি দুটি ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। একটি ধারার উদ্ভাবক ও পোষক মিশনারী ও অন্যান্য সাহেবরা। হালহেডের ব্যাকরণে বাংলা হরফের যে নমুনা আছে তাই দিয়ে একটি ধারার সূত্রপাত। এই ধারার হরফের মধ্যে যেন একটা ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। হরফগুলি একটু লম্বাটে ছাঁদের। ক্রমশঃ এরা যেন মেদ বোড়ে ফেলে তন্নী ও লাভণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। উইলকিন্সের তৈরী অক্ষরের পরে পঞ্চননের তৈরী হরফে ছাপা বাইবেলের পৃষ্ঠার প্রতিলিপি থেকে এই মস্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে। লন্ডনে ছাপা মুতুঞ্জয় শর্মা রচিত শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুস্তলিকা সংসাহন সংগ্রহ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের গ্রেট কুইন স্ট্রীটের কক্স অ্যাণ্ড বেইলিস্ মুদ্রাযন্ত্রে বইটি ছাপা হয়। এই বই থেকে ছাপার যে নমুনা দেওয়া হলো তা থেকে প্রমাণিত হবে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাইবেল ছাপা হবার পর বাংলা হরফের কত উন্নতি হয়েছে। লন্ডনের এই প্রেস থেকে আরও কয়েকটি বাংলা বই ছাপা হয়েছিল। হরফ তৈরী বোধ হয় ওদেশের কুশলী কর্মীরাই করেছিলেন।

দক ভালুক হবিণ আদি

আদি পুস্তক ।

যাহা যোশা রচিল ।

পৃথম পর্বে ।

- ১ পৃথমে ঈশ্বর সজ্জন করিলেন মূর্গ ও পৃথিবী ।
- ২ পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের ওপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোঁলায়মান
- ৩ হইলেন আগের ওপর ! পরে ঈশ্বর বলিলেন

শ্রীরামপুরে ছাপা বাহবেল; ১৮০২

এরপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বাংলা আইন ছাপা হয়। যে হরফ এ বই ছাপতে ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই মনোহরের তৈরী। এই ছাপার নমুনার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হবে যেন লাইনোতে ছাপানো। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ১৮২৮ সালের পর বাংলা টাইপ ফেসের আমূল পরিবর্তন কিছু হয়নি।

আর একটি ধারার মুদ্রণে ব্যবহৃত হত একটু ধ্যাবড়া ধরনের হরফ। একটা মোটা ধাঁচের হরফ ছিমছাম ভাবটা নেই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ছাপা জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত করুণানিধান বিলাস এই ধারার একটি উদাহরণ। লাইনো ব্যতীত অন্যান্য বাংলা মুদ্রণে এই ধারার হরফই চলে এসেছে। মিশনারী ছাপখানা ছাড়া ছাপাখানায় এই জাতীয় হরফেরই ছিল প্রাধান্য।

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে মিশনারীদের প্রভাব হ্রাস পাবার পর তাদের ব্যবহৃত ছিমছাম হরফগুলি ক্রমশঃ অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। তাই লাইনো প্রবর্তনের পর হঠাৎ আমাদের মনে হলো বুঝি বাংলা হরফ নতুন শ্রী পেলে। কিন্তু মনোহর যে এ কাজটা এক শতাব্দী পূর্বেই করে রেখেছেন তা শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা বই দেখলে জানা যাবে।

বাংলা এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় টাইপ ফেসের দৈন্যের জন্য অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম হলো হরফের সংখ্যা। রোমান বর্ণমালা ছাব্বিশটি অক্ষরেই সম্পূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার ছাপার কাজে প্রায় ছয়শ' হরফের প্রয়োজন। মৌলিক অক্ষর, যুক্তাক্ষর এবং পরিকল্পনা বিসর্গ প্রভৃতি চিহ্ন নিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। এতগুলি অক্ষরের আদল নতুন করে পরিকল্পনা করতে যাবার দায়িত্ব অনেক। প্রথমতঃ দক্ষ শিল্পীর অভাব। শিল্পী পেলেও প্রচুর অর্থ নিয়োগের আবশ্যিকতা। অর্থ ও সময় দিয়েও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। কারণ পরিকল্পিত নতুন ছাঁদের টাইপটি যদি মুদ্রাকর এবং পাঠকদের পছন্দ না হয় তাহলে সবটাই লোকসান। পছন্দ হলেও কিন্তু লাভের পরিমাণ এমন নয় যার জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা যেতে পারে। কারণ বাংলা মুদ্রণ শিল্পের উন্নতি যথেষ্ট হয়নি। সাক্ষরের হার না বাড়লে, বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে মুদ্রণের প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। তাই পঞ্চদশ ও মনোহরের পরে হরফ নির্মাণকুশলী শিল্পী কাউকে পাইনি আমরা। পাশ্চাত্যে এমন কত শিল্পী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন— ক্যাসলন, বাস্কারভিল, প্লানটিন, গ্যারামণ্ড, ইত্যাদি।

[‘শারদীয় যুগান্তর’ ১৩৭৭ থেকে মূল ছবি সহ পুনর্মুদ্রিত, বানান অপরিবর্তিত]

বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

[ইং ১৮৭০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে জাতীয় মেলার মাসিক সভার চতুর্থ অধিবেশনে প্রথম পঠিত]

সভ্য মহোদয়গণ! অদ্য আমি যে প্রস্তাবটি আপনাদিগের সমক্ষে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা যদিও আমার একান্ত মনোনীত বিষয় বটে, এবং এতৎ সংক্রান্ত বিষয় সমুদয় আন্দোলিত হইয়া যাহাতে দেশীয় মুদ্রাঙ্কণের প্রকৃত উন্নতির পথ পরিকৃত হয়, তাহা যদিও আমার একান্ত বাসনা, কিন্তু আমার এতাদৃশ কোন অভিলাষ ছিল না যে, আমি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধ আকারে পাঠ করি। স্বদেশোপকার-ব্রতরত আমার বন্ধু হিন্দুমেলায় প্রবর্তক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্রের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া আমি এতৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ফলতঃ আমার এরূপ বিশ্বাস যে, এক্ষেণে কেবল বক্তৃতাদি করিয়া বাকা ব্যয় করা বালচাপল্য ও বহুরম্ভমাত্র; বস্তুতঃ তদ্বারা দেশীয় প্রকৃত উন্নতির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত আমি বক্তৃতাদি করিতে অন্যন্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু, সম্প্রতি দিন দিন এই কলিকাতা মহানগরে মুদ্রাযন্ত্রের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাতে যে এই প্রস্তাবটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে এমত বোধ হয় না। যাহা হউক এক্ষেণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই কৃতার্থম্বন্য জ্ঞান করিব।

সভ্যগণ! কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবার পূর্ব্বে লোকদিগের মনোমধ্যে তদ্বিষয়ঘটিত একটি অভাব বোধ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক, এবং সেই অভাব দূরীভূত করিবার জন্য উপায় নিদ্ধারণ করিয়া একেবারে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত উন্নতির সোপান; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অস্বদেশীয় ব্যক্তিবৃহের অন্তরে এ উভয়েই সমানভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছে;— তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত কোন অসম্ভাব দেখিতেছেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কর্তৃক কোন প্রকার উন্নতিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাঁহারা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় যাহা কিছু, সমুদায়ই আমরা ইংরেজ বাহাদুরদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, হইতেছি ও হইব; তদ্বিষয়ে আর আমাদের কোনরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না; তাহার জন্য মস্তিস্ককে আর পীড়ন করিতে হইবে না, এবং তাহার জন্য আর উদ্ভাবনী শক্তিরও প্রয়োজন নাই। অতএব এই সমুদয় ভ্রান্তভাবে অস্বদেশীয় লোকদিগের মন হইতে একেবারে দূরীকরণান্তর যাহাতে অশ্রান্তভাবে সঞ্চর হয়, যাহাতে তাঁহারা দেশীয় মুদ্রাঙ্কণের অভাব পরম্পরা অবগত অবগত হইয়া তন্নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়ন, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

সভ্যগণ! মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক উৎকৃষ্টতর প্রবন্ধ রচনা করা, কি নানাপ্রকার বাক্পটুতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমার এইরূপ আকিঞ্চন যে, যে মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হইয়া পৃথিবীর অপরিসীম উপকার সাধন হইয়াছে,— যাহার প্রভাবে

নিয়ে কমপক্ষে ৬০০ হরফ। হাতে সাজিয়ে অর্থাৎ

মনুষ্যাগণ ইহ-জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতেছেন,—
 যাহার উদ্ভাবনে আমরা জ্ঞানলোক প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের যথার্থ সার্থকতা লাভে সক্ষম
 হইয়াছি,— ভাবিতে গেলে যাহার সমান মহোপকারী এই অবনিমণ্ডলে প্রায় লক্ষিত হয় না,
 — কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি ভূগোল, কি খগোল, কি খগোল, কি জ্যোতিষ, কি বাণিজ্য,
 কি ব্যায়াম, কি সঙ্গীত সমুদায়ের সহিত তুলনা করিলে, যাহাকে তৎসমুদায়ের বর্তমান উন্নতির
 মূলাধার বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়,— যাহার অভাবে মনুষ্যসমাজ অজ্ঞানতিমিরে
 আচ্ছন্ন থাকিত, সেই পরম শুভজনক মুদ্রাক্ষণের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়— সেই “দেশীয়”
 মুদ্রাক্ষণ বিষয় সমালোচিত হইয়া যাহাতে তাহার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, তাহারই আমার
 একান্ত বাঞ্ছনীয় ও অদ্যতন প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে আর সময় ব্যয় না করিয়া
 মুদ্রাক্ষণ কিরূপে ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হইল, প্রথমতঃ সংক্ষেপে তাহারই অনুসরণ করা যাউক।
 জগৎপিতা জগদীশ্বর যখন মনুষ্যাগণকে প্রথম সৃষ্টি করিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে
 পরস্পরের মানসিক ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একমাত্র বাক্য ব্যতিরেকে অন্যতর উপায়
 নিরূপিত ছিল না। কারণ পৃথিবীর আদিমকালের লোকসংখ্যা অতিশয় ন্যূন ছিল; সুতরাং
 তৎকালে অন্য প্রকার উপায়ের কোন প্রয়োজন হয় নাই। প্রয়োজন— অভাব-বিমোচন-কারক।
 অতএব ক্রমে ক্রমে যত মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল— ক্রমে যখন নানা লোক নানা

দ্বিপুর্ন।
 পুথ্য ভাগ।
 আমিরিকার দ্বিপুর্ন বিষয়।

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইউরোপ ও আদিয়া
 ও আমিরিকা। ইউরোপ ও আদিয়া ও
 আমিরিকা এই তিন ভাগ এক মহাদেশ আছে ইহার কোন
 সমুদ্রবর্তী বিভক্ত নয় কিন্তু আমিরিকা পৃথক এক দ্বীপে
 পুথ্য দ্বীপহইতে সে দুই হাজার কোশ অন্তর। অনুমান
 হয় তিন শত চাষিণ বৎসর হইল আট শত আটশত হই
 শালে আমিরিকা পুথ্য আনা গেল তাহার পুথ্য আমে
 রিকা কোন লোককর্তৃক আনা ছিল না এই নিমিত্তে
 তাহার পুথ্য দ্বিপুর্নের বিবরণ লিখি।

যেহতুক পৃথিবীর মধ্যে যে কর্ম হইয়াছে সেই
 কর্মহইতে এক কর্ম বহু। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত
 হইল তদুক পর্যন্তের গণ পুথ্য আনা গেল তাহার গণ
 এই যে তাহাকে কোন লোকই গণিলে সে লোকই সর্বদা দুই
 কেন্দ্র অর্থাৎ গুণ্ডর ও হক্সিন ভাগে থাকে সেই লোকই
 কোল্লাসের মাঝে দিলে সমুদ্র দুই দিক্তার গুণ্ডরে যে
 কোন দ্বীপ কোন লোক থাকে সেই কোল্লাসের দ্বীপ পৃথি
 বীর সকল ভাগ সে আদিতে পারে। কোল্লাসের গঠন এই
 মত এক কাণাজের গুণ্ডরে মতলকতি করিয়া বহির্গত সমা
 নান-স্বরূপে চতুর্দিকে সকল দিগে ও বিদিশে ও গুণ্ডরে
 ক ল

প্রথম বাংলা মাসিকপত্র: দিগদর্শন (১৮১৮)

DOUBLE GREAT

In Font 20 Kg.

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী
 স্বনাম পুরুষঃ ধন্যঃ ১২

DOUBLE GREAT (COMP.)

In Font 20 Kg.

প্রেমের চাকা চলিলেই লাভ হয়
 বাস্তবিক পক্ষে উক্ত ধারণাটি ভুল
 ১২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০

GREAT ANTIQUE

In Font 25 Kg.

প্রিন্টার নহোদকরণের
 নিকট স্থখ্যতি অর্জন
 করিতেছে কেন ১২৪

বিভিন্ন বাংলা হরফের নমুনা: ইস্টার্ন টাইপ ফাউন্ড্রি

০। অথচ আধিক্য ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ইত্যাদি কম্পোজ করে বই ছাপাতে গেলে বাংলায় কমপক্ষে

SMALL PICA ANTIQUE

In Fount 30 Kg.

নিজের বিচার শক্তি দ্বারা টাইপের ভাল মন্দ বুঝা যায়। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের দিন দিন প্রসার হইতেই থাকিবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্টিং কারখানের দিন দিন স্ত্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সুতরাং কোন উপায় অবলম্বন করিলে সুন্দর এবং আর্টিস্টিক ছাপা হইতে পারে, তাহা প্রিন্টার মাস্ট্রেরই এখন বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ১২০৪৫৬৭৮৯০

PICA ANTIQUE

In Fount 20 Kg.

টাইপ সবন্ধে প্রিন্টারগণের অভিজ্ঞতা।

আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রিন্টার বছরদিন যাবৎ প্রিন্টারী কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও টাইপ সবন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ, যেহেতু টাইপই ছাপার কার্যের প্রধান অঙ্গ। বাস্তবিক কোন কোন গুণ থাকিলে টাইপ ভাল হয়, তাহা জানা থাকিলে অগ্নের কথার উপর নির্ভর করিতে হয় না। ১২০৪৫৬৭৮৯০

ENGLISH

In Fount 20 Kg.

শিল্প কার্যের সুবিশেষ সহায়তা বৃদ্ধনের জন্য ছাপা কার্যের প্রচলন ক্রমান্বয়েই বাড়িয়া চলিয়াছে একঘাটীত সাহিত্য প্রচার ক্ষেত্রেও ইহার বহু বিস্তার ঘটিয়াছে। দিন দিন রুচির পরিবর্তন হইতেছে, অতএব কোন কার্য আরম্ভ করিবার আগেই ১২০৪৫৬৭৮৯০

PICA

In Fount 37 Kg.

শিল্প কার্যের সুবিশেষ সহায়তা বৃদ্ধনের জন্য ছাপা কার্যের প্রচলন ক্রমান্বয়েই বাড়িয়া চলিয়াছে একঘাটীত সাহিত্য প্রচার ক্ষেত্রেও ইহার বহু বিস্তার ঘটিয়াছে। দিন দিন রুচির পরিবর্তন হইতেছে, অতএব কোন কার্যের আগেও টাইপ বহিল করিবার সমগ্র প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে টাইপের বেশ আধুনিক বহনের কি না, বিজ্ঞায়িত সেবিতে হইবে তাহার মাত্রা মিল আছে কি না, কৃত্রিমত্ব মৌল্য ভাল কি না, প্রত্যেক টাইপের উচ্চতা সবন্ধে কোন প্রত্যেক আছে কি না? ১২০৪৫৬৭৮৯০/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০

SMALL PICA

In Fount 37 Kg.

দিন দিন রুচির পরিবর্তন হইতেছে, অতএব কোন কার্য আরম্ভ করিবার আগেই প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে টাইপের বেশ আধুনিক বহনের কি না, বিজ্ঞায়িত সেবিতে হইবে তাহার মাত্রা মিল আছে কি না, কৃত্রিমত্ব মৌল্য ভাল কি না, ইহা হইলে প্রত্যেক উচ্চতা সবন্ধে (খাট করা) ৪*** ছাপা হইতে পারিত, ছাপা ভাল মদ বিশেষ লক্ষ্য করিতেন না সুতরাং টাইপ খারাপ হইয়া থাকিলেও বঙ্গের হইতে বঙ্গদেশেই চলিয়া যাইত। কিন্তু আধুনিক উচ্চ প্রণালীর সাধন্য বেশিদিন প্রতি ফটার অনায়াসে ১***১২** ছাপা হয়। ১২০৪৫৬৭৮৯০/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০

BOURGEOIS

In Fount 20 Kg.

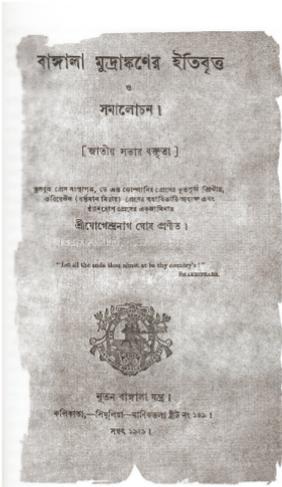
অধিকার সুবিশেষ সহায়তা বৃদ্ধনের জন্য ছাপা কার্যের প্রচলন ক্রমান্বয়েই বাড়িয়া চলিয়াছে একঘাটীত সাহিত্য প্রচার ক্ষেত্রেও ইহার বহু বিস্তার ঘটিয়াছে। দিন দিন রুচির পরিবর্তন হইতেছে, অতএব কোন কার্য আরম্ভ করিবার আগেই ১২০৪৫৬৭৮৯০

বিভিন্ন বাংলা হরফের নমুনা: ইস্টার্ন টাইপ ফাউন্ড্রি

বিভিন্ন বাংলা হরফের নমুনা: ইস্টার্ন টাইপ ফাউন্ড্রি

স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল, তখন তাহাদিগের মধ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অপর একটি উপায় নির্ধারণের আবশ্যক হইতে লাগিল। সেই সময়ে “হাইরোগ্রাফিক” অর্থাৎ পবিত্র লিপির আবিষ্কার হয়। ইহা দ্বারা তৎকালের লোকদিগের এবং বর্তমান সময়েও অনেক উপকার দর্শিয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এতদ্বারা অতি পুরাকালের অনেকাংশে কাল নিরূপণাদি সংঘটন হইয়াছে কোন ব্যক্তি ইহার সৃষ্টিকর্তা তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই, এবং তাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়াও অদ্যকার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। অতএব এতবৎসম্বন্ধে আর দুই এক কথার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

এক্ষণে আমরা যেমন পুস্তকাদি প্রচার দ্বারা জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকি, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় সেইরূপ উপরোক্ত লিপি দ্বারা বিখ্যাত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা ছিল। সেই সকল লিপি কোন বিশিষ্ট অক্ষরবদ্ধ নহে। উহা প্রতিমূর্ত্তি বা অন্য কোন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা সমাধা করা হইত। সুতরাং আপামর সাধারণে তৎপাঠে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। তৎকালে মিসরী, সিরিয়ান ইত্যাদি অপরাপর জাতিদিগের মধ্যে উক্তপ্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। যে সকল ঘটনা লোকেরা (তৎকালের) লোকেরা স্মরণীয় করিবার মানস করিতেন, তাহাই বৃক্ষে বৃক্ষে, ইষ্টকে এবং বিশেষতঃ প্রস্তরে খোদিত করিয়া রাখিতেন। কখন কখন ঐসকল



বঙ্গালী মুদ্রাক্ষণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন (১৮৭৮):
নামপত্র

বঙ্গালী মুদ্রাক্ষণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন (১৮৭৮):
প্রথম পৃষ্ঠা

গিরির অভ্যন্তর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম যে, সেই পার্শ্বতীয় শিলায় বহুদূর খোদিত লেখা রহিয়াছে। ইহাকে “লিখিত উপত্যকা” কহে। অতঃপর আমরা জাবেল এন্ড মুকাটের নামক অপর একটি পর্বতের নিকট দিয়া বঙ্গালী মুদ্রাক্ষণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন হইতে ১০/১২ ফিট উচ্চে সেই পর্বতের কঠিনতর শিলায় উপর অসংখ্য অসংখ্য লেখা খোদিত। উহাকে “লিখিত পর্বত” নামে উক্ত করিলেও করা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, হিব্রু, গ্রীক, সিরিএক, কপ্টিক, লাতিন, আরমানি, তুরস্ক, ইংরাজী, ইলিরিয়াম, জর্মনি, ফরাসি এবং বোহিমিয়ান ভাষা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ ভাষায় খোদিত, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না; বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতাদৃশ ভয়ানক স্থান—যেখানে আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে কিরূপে পূর্বেও সুকঠিন লিখনকার্য সমাধা হইল! এইরূপ হাইরোগ্লিফিক্ সংক্রান্ত ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। জগন্নাথদেবের মন্দিরে ও অন্যান্য স্থান হইতেও নানাপ্রকার প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে কি লিখিত আছে তাহা অদ্যাবধি কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়েন নাই। যাহা হউক, হাইরোগ্লিফিক্ যদিও সকলকার বোধগম্য নহে, তথাচ ইহার দ্বারা যে পৃথিবীর কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অনেককানেক অনুসন্ধ্যায়ক ইহার সাহায্যে ইতিহাসের তারিখাদি ও বিবিধ বিষয় নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন। প্রত্যুত হাইরোগ্লিফিক্ লিপি যে পৃথিবীর প্রথমাবস্থায়ই প্রচলিত হয়, তাহা একপ্রকার স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তৎকালে নিয়মবদ্ধ লিখনপ্রণালী প্রচলিত থাকিলে কদাপি পূর্বেও স্বেচ্ছানুসারী লিপির ব্যবহার ব্যবহার থাকিত না।

ইত্যাদির পর এক সময় হাফটোন ব্লক। হাফটো
উল্লিখ করার কারণ এই সাহায্যের সঙ্গে জুড়ি

”	”
;	
শ	ষ
প	ি
৫	
৫	

সম্বাদ ভাষ্কর

**ভূত বৌধিবস্বাঙ্ক কিচেররসে মেনস্য নায়ঙ্কনো দেষযান্ত দিগন্তরংক নতে হবয়ান মত্রোচিতম্।
তো ভেঃ সংপূরুখাঃ কুরুধুম্বনা সংকৃত্যঅতাদরা দৌরীশঙ্কর পূর্নপর্কিত মুখা দুঙ্কনু ততে ভাষ্কঃ**

০০-সংখ্যে১৭ ধারন ইং ১৩১০ দারন ৫-৫৫ ৫ ২ নিন জ ০৫ ৫ ভাষ্কঃ ১২২২ দারন ২০ টার ময়লগার দুগা মনে ১ টাকার ৫ টাকার ১

অতঃপর অক্ষর-রূপ-সূচক চিহ্নের উদ্ভব হইয়া নিয়মবদ্ধ হস্তলিপির সৃষ্টি হয়। সেই লিপির অদ্যাবধি ভূ-মন্ডলের সর্বজাতির মধ্যে সচরাচর প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার উদ্ভাবনে পূর্বোল্লিখিত হাইরোগ্লিফিক অপেক্ষা কত গুণে যে মানবমন্ডলীর সুবিধা জন্মিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। অতএব এতদ্বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র।

নিয়মিত অক্ষর দ্বারা হস্তলিপির প্রচার বিষয়ে অনেক প্রকার কপোল-কল্পিত-বাক্যের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ এরূপ সমর্থন করেন যে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য কর্তৃক এতাদৃশ সুপ্রণালীসিদ্ধ ও পরিশুদ্ধ নৈপুণ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ অক্ষরের সৃষ্টি কখনই সম্ভাবিক নহে। ইহা করুণাময় বিধাতা জনসমাজের কার্যসৌকর্যার্থে স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, মনুষ্য-বুদ্ধি সংযোগেই ইহার উৎপত্তি, এইরূপ নানালােকে নানা প্রকার বাক-বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, সে যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি কিরূপে যে এই হস্তাক্ষর প্রণালীর প্রথম সূত্রপাত করেন, তাহার স্থিরতর মীমাংসা করা দুর্ঘট। এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান সুশৃঙ্খল হস্তলিপি প্রচার হওয়াতে পূর্বতন হাইরোগ্লিফিক অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

হস্তলিপির উদ্ভাবনে জ্ঞানালোচনার এক প্রকার পথ পরিস্কৃত হইল। এরূপ কিম্বদন্তি আছে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যখন মুনি-ঋষিরা গিরিগুহায় ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহারা শিষ্যদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সময়ে সময়ে শ্লোকাদি রচনা করতঃ অপরিশুদ্ধ বৃক্ষপত্রের নখর অথবা শলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিতেন। কিন্তু এইরূপ লিপি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ক্রমে শিষ্যেরা তালপত্রের লৌহময় লেখনী সংযোগে লিখনকার্য নিব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমাবস্থায় বৃক্ষপত্র লিখন কার্যে ব্যবহৃত হওয়া প্রযুক্ত, বোধহয়, অদ্যাবধি পুস্তকের এক এক ফর্দ কাগজ ‘পাতা’ শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে উড়িষ্যাদেশস্থ অনেক ব্যক্তি পাল্কির আড়ডায় বসিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে তালপত্রের লিখনকার্য সমাধা করিয়া থাকে, ইহা সভ্য মহাশয়েরা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকিবেন। এই তালপত্রাক্রিত লিপি পূর্বার্বেক্ষা অনেকদিন স্থায়ী হইল বটে, কিন্তু পত্র ও লিখন উভয়েরই এক বর্ণ হওয়াতে তাহা পাঠকালে বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটতে লাগিল। একারণ তাৎকালিক

ব। তাঁরা ব

র্জু	র্চ
র্ড	র্ষ
র্ধ	র্ভ
র্ডু	র্চু
র্ডু	র্ক্ষ
র্ডু	র্গী
র্ডু	র্গি
র্ডু	র্গু

কু
জু
বু
গু
ঘু
কু
কু
থ

লোকেরা লিখিত তালপত্রের উপরে গেরিমাটী অথবা অঙ্গরাচূর্ণ ঘর্ষণ করিতেন। তদ্বারা অক্ষর সকল রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ও সুস্পষ্ট হইয়া পূর্বোপেক্ষ পাঠের বিস্তর সুবিধা করিয়া দিত। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি কখন এতাদৃশ সামান্য উন্নতিতে নিরস্ত থাকিবার নহে— ক্রমে ক্রমে এক উন্নতি হইতে অন্য উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে লাগিল।— অবশেষে তেরেটপত্র, লেখনী ও মসী এই তিন বস্তু সংযোগে লিখন প্রণালীর আবিষ্কার হইল। এতদ্বারা যে কীদৃশ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই অবধি কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, কি ভূগোল, সমুদয় শাস্ত্রই এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেই অবধিই ভারতবর্ষের সৌভাগ্যসূর্য্য উদয় হইয়াছে।

সভাগণ! পূর্বোক্ত তেরেটপত্র কিরূপে তারা বোধ করি আপনারা অনেকেই দৃষ্টিগোচর করেন নাই; এ নিমিত্ত আমি সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা তাল জাতীয় বৃক্ষপত্র। (প্রদর্শন) এই পত্র কাগজ অপেক্ষা স্থায়ী। কাগজে জল লাগিলেই গালিয়া যায় এবং পোকায় সহজে নষ্ট করে, কিন্তু এই তেরেট শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নহে। ইহা অযত্নেও বহুকাল স্থায়ী হয়। এদিকে যেমন তেরেটপত্রের প্রচার হইল, অন্যদিকে আবার তদুপযুক্ত মসীরও সৃষ্টি হইল। এক্ষণে যাঁহারা একমাত্র ইংরাজী মসীর স্থায়িত্ব বিষয়ে প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত পূর্বতন প্রাচীন হিন্দুদিগের একটি মসী প্রকরণ এস্থলে সংগৃহীত হইল, যথা;—

‘তিন ত্রিফলা করি মেলা, ছাগ দুধ্ধে দিয়া ভেলা।
লোহাতে লোহা ঘষি, জলে ঘষিলে না উঠে মসী।’

এই মসী এরূপ চিরস্থায়ী যে বহুকালেও বিনষ্ট বা বিবর্ণ হয় না, বরং বারি সংযোগে দ্বিগুণতর ওজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইতে থাকে। আপনারদের গোচারার্থ সাত শত বৎসর পূর্বের লিখিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পত্রও এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। (সভাগণের হস্তে প্রদান ও সকলের দৃষ্টি) এই মসী কিঞ্চিৎ মাত্র বিবর্ণ হয় নাই, যেমন তেমনই আছে।

সভাগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা কিরূপে মসী ব্যবহার করিতেন এবং তাহা কিরূপে বুদ্ধি কৌশলে প্রস্তুত করা হইত। একদিকে যেমন লিপিবদ্ধ প্রণালী পরিশুদ্ধরূপে চলিল, অন্যদিকে আবার তদনুরূপ নানাপ্রকার উন্নতির স্রোতও প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক এক ব্যক্তি ধীরচিন্তে যেরূপে বৃহৎ পুঁথি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে লিপিবদ্ধ

গেছে
রিতচন্দ্র
না ‘গৌরী

ঘর

কু
চু
চু
চু
চু
কু

একমেবাদিতীয়ং

চতুর্থ ভাগ
২২৬ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৪ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৯০৬

১৯০৬

একমেবাদিতীয়ং জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৪ শক
১৯০৬

করিতেন তাহা এক্ষণে স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়, এবং তাঁহাদের অপরিসীম ধৈর্য্যগুণের ভূয়োভূয়ঃ প্রসংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেহ কেহ এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে পারিতেন যে, রামায়ণ কিংবা মহাভারত একখানি পত্রমধ্যে সমাপ্ত করিয়া দিতেন; লোক সেইসকল বিচিত্র লিপি মাদুলী অথবা কবজ মধ্যে স্থাপন করিয়া কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করিত। এইরূপ নানাবিধ বিষয় পয়্যালোচনা করিলে ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, তৎকালে যদিও সৃষ্টি হয় নাই, তথাপি ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ একমাত্র হস্তলিপির সাহায্যে জ্ঞানালোচনার শ্রীবৃদ্ধি যতদূর হইতে পারে, তাহা করিয়া গিয়াছেন?

(এস্থলে শ্রীযুক্তবাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের লিখন পারিপাট্য প্রদর্শন ও সকলের উৎসূক্য ও আনন্দ প্রকাশ।)

অনন্তর হস্তলিপি প্রচারের অনতিকাল পরেই মোহরাদি দ্বারা ছাপিব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রাজকর্মচারী এবং উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারিতেন না। যে সকল রাজকর্মচারী বিবিধ কর্মে লিপ্ত থাকিয়া আপনাদের পরিশ্রমের ভার লাঘব পরিবার মানস করিতেন; তাঁহারা কেবল উক্ত মোহরাদি ব্যবহার করিতেন। এইরূপ দুইটি প্রাচীন পিণ্ডলের মোহর অদ্যাবধি “ব্রিটিশ মিউজিয়াম” নামক চিত্রশালায় এবং নিউকাসলস্থ ‘এন্টিকোয়েরিয়ন্’ নামক সমাজে স্থাপিত আছে। একটি গ্রীক ভাষায় অপরাট রোমকীয় ভাষায় খোদিত। মোহর ভিন্ন অস্বদেশীয় অনেকানেক রাজা অঙ্গুরীতে আপন আপন নাম খোদিত করাইয়া পত্রাদিতে মুদ্রিত করিতেন। অতঃপর পুস্তক-চিত্র, প্রথা, ছবি ও খেলিব্যবস্থা মুদ্রিত করণোপায় এবং অক্ষর সম্বলিত মুদ্রা প্রস্তুত করিবার পন্থা প্রচলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার সামান্য সামান্য উন্নতি পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চীনদেশে মুদ্রাঙ্কণের প্রথম সূত্রপাত হয়। ইহা কোন্ সময়ে, কি প্রকারে এবং কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়, তাহার কোন স্থিরতর মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে চীনদেশীয় একটি সুবিখ্যাত প্রাচীন প্রবাদবাক্য পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, বাদশাহ ভেন ভং খ্রীষ্ট জন্মাব্দ ১১২০ বৎসর পূর্বে কোন একটি বস্তু খোদিত করেন, তদ্বিষয় ঘটিত এরূপ বর্ণনা আছে যে, যে মসী খোদিত অক্ষরকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে, তাহা যেমন কস্মিনকালেও শুব্রবেশ ধারণ করে না, সেইরূপ যে হৃদয় একবার পাপরূপ মসীতে কলুষিত হইয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকিবে। এতদ্ভিন্ন আর কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চীনদিগের অক্ষর পূর্বে কথিত হাইরোগ্লিফিক্ সদৃশ। তাহার সংখ্যা ৮০,০০০ হইতে ১,০০,০০০ পর্য্যন্ত; কিন্তু ডাক্তার মরিসনের অভিধানে ৪০,০০০ মাত্র বর্ণিত আছে। যে যে জাতির মধ্যে প্রথমাবস্থায় হাইরোগ্লিফিক্ লিপি প্রচলিত ছিল, তাঁহারা সকলেই কাল সহকারে উক্ত লিপির পরিবর্ত সাধন করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে চীনদিগের কোন উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহারা আপনদিগের আদিম হাইরোগ্লিফিক্ লিপি কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া তাহাতেই এক অপূর্ব সংস্কার করণান্তর চালাইয়া আসিতেছে। চীনদিগের মুদ্রাঙ্কণ— অক্ষর ও হস্তাক্ষর উভয়ই সমান। চীনদেশে আদৌ মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হয়, এজন্য তাহাদের মুদ্রাঙ্কণ প্রশালী

অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রোতৃবর্গ স্বভাবতঃ কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন; অতএব এস্থলে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে।

চীনেরা যে সকল বিষয় মুদ্রিত করিতে অভিলাষ করে, প্রথমতঃ তাহা একখানি পাতলা স্বচ্ছ কাগজে করিয়া অতি নমনশীল কাষ্ঠোপরি উলটাইয়া বসাইয়া দেয়। কাগজ অতি পাতলা ও স্বচ্ছ বলিয়া লিখিত কাগজের অপর পৃষ্ঠা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। পরে সেই সকল লিপি খোদিত করিয়া মুদ্রাঙ্কণের উপযুক্ত হইলে তদুপরি একখানি বুরুস সংযোগে মসী করণান্তর ছাপিবার কাগজ বসাইয়া দিতে হয়। অতঃপর আর একখানি কোমল বুরুস উক্ত কাগজের উপরিভাগ দিয়া এরূপ কৌশলে টানিয়া লইতে হয় যে, তাহাতে কাগজের কোনরূপ হানি না হইয়া অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রাঙ্কণ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডিউ হাল্‌ডী নামক জনৈক ওলন্দাজ পর্যটক এরূপ বর্ণনা করেন যে, উক্ত প্রকারে চীনেরা সমস্ত দিনে ১০,০০০ তা কাগজ মুদ্রিত করিতে পারে, কিন্তু এতদ্বিষয় অসম্ভব বলিয়া বোধহয় কারণ যখন বর্তমান সুপ্রণালী সিদ্ধ মুদ্রায়ন্ত্রে সমস্ত দিনে উৎকৃষ্টরূপে ছাপিতে হইলে পাঁচশত কাগজ দুই পৃষ্ঠা ছাপা সুকঠিন হইয়া ওঠে, তখন পূর্বেোক্ত অসুবিধাজনক প্রণালী অনুসারে কি প্রকারে উক্ত সংখ্যক কাগজ ছাপা হইতে পারে? যাহা হউক, উল্লিখিত মুদ্রাঙ্কণ বহুব্যয়-সাধ্য ও তাহাতে বিস্তর সময় আবশ্যক করে, এজন্য তদ্বারা পৃথিবীর বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যে মহাত্মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা পুস্তকাদি মুদ্রিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনিই এই অদ্ভুত শিল্পবিদ্যাকে মানবজাতির যথার্থ মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন। বোধ হয়, এরূপ রীতিও প্রথমে চীনদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। “স্টানিসলাম জুলিয়েন” নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, খৃষ্টীয় শকের ১০৪১ অবধি ১০৪৮ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীনদেশীয় জনৈক কন্মকার দক্ষ-মুক্তিকা-নির্মিত কতকগুলি অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিল।

কিন্তু ইদানীং ইয়ুরোপে এ বিষয়ের নূতন সৃষ্টি হওয়াতে যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে তারা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরের মধ্যে কোন সময় স্ট্রাসবর্গ নিবাসী গটেনবর্গ এবং হার্লেম নিবাসী কোস্টার এই দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রাবিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কোস্টার উল্লিখিত হার্লেম নগরের নিকটবর্তী এক বন মধ্যে পর্যটন করিতেছিলেন, সহসা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষের ত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া তাহা কাগজে মুদ্রিত করিলেন। সামান্য মসীতে মুদ্রিত করিতে গেলে কাগজ আর্দ্র ও অক্ষর সকল অপরিষ্কৃত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি একপ্রকার ঘন মসী প্রস্তুত করিলেন, এবং এক এক কাষ্ঠ-ফলকে বহু শব্দ একত্র খুদিয়া একেবারে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে মহোপকারী যন্ত্রদ্বারা ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ সংবর্দ্ধন বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপে দুই এক মনুষ্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাহার সূত্রপাত হয়!

গটেনবর্গ ও কোস্টার উভয়েই প্রথমে কাষ্ঠ-ফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রিত করিতেন। পরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাষ্ঠময় অক্ষর নির্মাণ করেন। পরিশেষে যখন শেফার নামে এক

শিল্পকুশল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধাতুনির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন এ বিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠনির্মিত মুদ্রায়ন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই যন্ত্রের নাম “ব্লেউস যন্ত্র”। উইলেম্ জসেন্ ব্লেউস নামক জটনিক বিচক্ষণ শিল্পকুশল ব্যক্তি এমেস্টার্ডাম নগরে কাষ্ঠযন্ত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন, এইজন্য উক্ত যন্ত্র তাঁহারই নামে আখ্যাত হইয়াছে। কথিত যন্ত্রের আকৃতি কিরূপ, সভ্যগণ সকলেই তাহা দেখিয়া থাকিবেন; অতএব এস্থলে সে বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ন্যূনাধিক ১৯/২০ বৎসর অতীত হইল মহানগরী কলিকাতার বটতলা নামক স্থানে উক্ত কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে যাহা কিছু ছপিবার প্রয়োজন হইত উক্ত প্রকার যন্ত্রে তৎসমুদয় মুদ্রাঙ্কিত করা হইত। উল্লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র অদ্যাবধি কোন কোন মুদ্রায়ন্ত্রালয়ে “প্রফ প্রেস” স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাতে মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। পরে স্টানহোপ নামে এক শিল্পনিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্মাণ নামে খ্যাত। তদনন্তর “এলবিয়ন্”, “ইম্পিরিয়ল” এবং “কলম্বিয়ন্” নামক লৌহযন্ত্রের নামে খ্যাত। তন্মধ্যে কলম্বিয়ন্ অর্থাৎ যাহাকে চিলেপ্রেস কহে, তাহা বহু অংশে উৎকৃষ্ট। পরিশেষে বিবিধ প্রকার বাষ্পীয় মুদ্রায়ন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া মনুষ্যসমাজের যে কতদূর জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সভ্যগণ! অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কণের কীদৃশ সাধন হইয়াছে, আপনারা তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

যে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে সভ্যতা পদে আরোহণ করিয়াছে; যে ভারতবর্ষ এক সময়ে অতি প্রত্যাশাস্বিত ও অতি গৌরবাস্বিত রাজন্যগণের নিবাসভূমি ছিল; যে ভারতবর্ষে মহান মহান জ্ঞানচূড়ামণি সকল জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার জ্যোতি অদ্যাবধি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে; সেই ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কণ প্রচলিত ছিল কিনা, তদ্বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক।

আপনারা সকলেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, ভারতবর্ষের যথাযথ প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা সুকঠিন। কেবল রামায়ণ, মহাভারত, রাজতরঙ্গিনী (কাশ্মীরের ইতিহাস), মনুসংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে ভারতের যৎকিঞ্চিৎ অবিশদ প্রাচীন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এইসকল গ্রন্থে মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় কোন কথাই উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং অদ্যাবধি একখানিও পুরাকালের মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ কাহারও নয়নপথে পতিত হয় নাই; সকলেই পূর্বেকার হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়া আসিতেছেন। সুতরাং কিরূপে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে? কিন্তু যখন প্রাচীন ভারতবর্ষ তৎকালে সকল জাতিকে সভ্যতা ও সভ্যতাসম্ভূত শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি আর আর বিবিধ বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছিল, যখন ভারতবর্ষই পৃথিবীর অনেকাংশে দেশে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছে, তখন যে ভারতমধ্যে কোনপ্রকার মুদ্রাঙ্কণের সৃষ্টি হয় নাই, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তৎকালে অবশ্য কোন না কোনরূপ মুদ্রাঙ্কণ প্রচলিত ছিল, ইহা অনেক কারণেই উপলব্ধি জন্মে। তৎকালে যেরূপ বিদ্যাচর্চা ছিল, যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল বিরচিত হইয়াছিল এবং তৎকালের

লোকদিগের যেরূপ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা মুদ্রায়ন্ত্র করিতে পারেন নাই, কি করেন নাই, আমার বিবেচনায় তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে এরূপ হইতে পারে যে, তৎকালে সর্বসাধারণ মধ্যে মুদ্রায়ন্ত্রের আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচীনতমকাল হইতে “ছিট” ছাপিবার ধারা প্রচলিত আছে। “দুই সহস্র বৎসরেরও পূর্বে সুবিখ্যাত রোমীয়দিগের উন্নতি সময়ে তাহারা ঢাকাই বস্ত্রের প্রশংসা করিত। ছিট বিষয়েও পূর্বে হিন্দুদিগের এই প্রকার গরিমা ছিল। ভারতবর্ষীয় ছিট পৃথিবীর সর্বত্র ছিটের আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইত। অতএব ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছিপিখানা অতি প্রাচীন কালবধি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ছিপিখানার সহিত ছাপাখানার সৌসাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত ইহাকে তৎকালোদ্ভব বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অপিচ ছাপাখানা যে আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বকালের অনেক পূর্বে ছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

প্রথমতঃ মনে করুন একস্থানে ব্যক্তি চতুষ্টয় উপবেশন পূর্বক আমোদ-আহ্লাদ করিতেছেন, এমন সময় সহসা অপর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত বাক্যলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়গণ! আপনাদিগের কি কাজকর্ম করা হয়।” প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিলেন, “আমি কথবটসেন হারপারের দোকানে কেরাণীগিরি করিয়া থাকি।” দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “আমি ববার্টসন কোম্পানির জুতার দোকানে কাজ করি।” তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, “আমি রেলওয়ে কোম্পানির আপিসের রাইটর।” চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন, “আমি ছাপাখানায় কাজ করিয়া থাকি।” সেই মাত্র তিনি ছাপাখানার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন— যেই সেই বাক্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সেই আগন্তুক ব্যক্তির অন্তঃকরণে তুচ্ছতাচ্ছল্যভাবের উদয় হইলে, অমনি তিনি এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন— “ছা-পা-খা-না!!!” সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ছাপাখানা বলিবামাত্রই সে ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে এতাদৃশ তাচ্ছল্যভাব সঞ্চারণের মূলীভূত কারণ কি? মুদ্রায়ন্ত্র-বিষয়ক জ্ঞান কি এত হীন, এত নিকৃষ্ট, যে তাহা শিক্ষা করিতে বিদ্যাবুদ্ধির লেশমাত্রও প্রয়োজন করে না? তবে “ছাপাখানা” শব্দটি একবার উচ্চারিত হইলে আর তাহাতে গুরুত্ব থাকে না কেন? মুচির কেরাণীগিরি এবং গাড়াওয়ানের নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা অপেক্ষা কি ছাপাখানার কার্য এত হয়ে?

সভ্যগণ! পূর্বেক্ত কারণে এরূপ বোধ হয় যে, ছাপাখানা এদেশে নূতন নহে, উহা ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিবার বৎসর পূর্বে প্রচলিত ছিল। সময়ে কোন প্রকার উপপ্নবে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ছিপিখানা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান থাকা প্রযুক্ত ছাপাখানার যে সত্ত্ব তাহা তাহাতেই বিলীন হইয়া আছে। এজন্য সর্ব-সাধারণে ছাপাখানার কার্যকে ছিপিখানার মত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ ছাপাখানায় যদিচ অনেক সামান্য সামান্য লোকও কার্য করে বটে, কিন্তু রেলওয়ে, রবার্টসন সুমেকার ও রাইটরগিরি বলিলে ত স্বভাবতঃ কাহারও মনে তাদৃশ ভাবের সঞ্চারণ হয় না! অতএব ইহাতে

লিখিত মতে জানিবা।

স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ছাপাখানা আমরা অপর জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে কদাচ ছাপাখানা শব্দের এত অগৌরব হইত না।

দ্বিতীয়ঃ বঙ্কাল পূর্বের ভারতবর্ষে মুদ্রায়ন্ত্র ছিল তাহার একটি অখণ্ড প্রমাণ এই যে, ১৮৭০ সালের ১ লা মার্চের জেস্টেলম্যানস্ জরনেল নামক ইংরাজি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহস্রা বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষে মুদ্রায়ন্ত্রের ব্যবহার ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভারতবর্ষের রাজ্যকালীন বারাণসী জেলার একস্থলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশলা একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া দেখেন যে, তথায় একটি খিলান রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে, তথায় একটি মুদ্রায়ন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও অক্ষরাবলি মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রায়ন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল একালের নয়, অন্যান্য সহস্র পূর্বের হইবে।

সভ্যগণ! এক্ষণে আপনারা শুনিলেন যে জননী ভারতভূমি মধ্যে এক সময়ে মুদ্রায়ন্ত্র ছিল। যদিচ পুরাকালের কোন মুদ্রিত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয় না; কোন গ্রন্থে মুদ্রায়ন্ত্রের নাম-গন্ধও নাই, এবং অবগতি হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না; কিন্তু একমাত্র গবেষণা দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইল, অতএব এইরূপে মুদ্রায়ন্ত্র সম্পর্কীয় আরও যে ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার আর বিচিত্র কি?

এক্ষণে দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা মাতৃসম্পত্তি তিলার্দ্ধও প্রাপ্ত হই নাই। আমরা যে বর্তমান মুদ্রায়ন্ত্র ও মুদ্রায়ন্ত্র সম্পর্কীয় নানাপ্রকার উপকরণ সম্ভোগ করিতেছি, তৎসমুদায় ইংরাজেরা আমাদের দেশে আনয়ন করিয়াছেন; এবং যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মুদ্রাঙ্কর আমরা ব্যবহার করিতেছি, তাহাও তাঁহাদের আনুকূল্যে সৃষ্টি হইয়াছে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আমাদের দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কর ব্যবহার হয়। মাষ্টার এনড্রুস নাম জনৈক পুস্তক বিক্রেতা স্থগলীতে একটি মুদ্রায়ন্ত্র স্থাপিত করেন, তথায় হেলহেড্ সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্বের বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকাদি কিছুই ছিল না, এবং বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কর কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও কেহ অবগত ছিলেন না। অতঃপর মাষ্টার উইলকিন্স (যিনি সার চারলস্ নামে খ্যাত) সাহেব বহুত্ব সহকারে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কর প্রস্তুত করিবার দ্বারোদঘাটন করিয়া বঙ্গদেশের অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মাকে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্করের আদি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না,— ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্বিস পরীক্ষার একজন মেম্বর ছিলেন, এবং এতদেশীয় বিবিধ ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক গবর্নর জেনরেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের আনুকূল্যে তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত 'ভগবদগীতা' ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া ইউরোপের বিজ্ঞানসমাজে প্রচার করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি এতাদৃশ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ছয়-সাত বৎসরকাল এতদেশ অবস্থিতি করণান্তর স্বয়ং মুদ্রাঙ্করের ছেনী প্রস্তুত করিতে অভ্যাস

৩০

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

ছেনী একজনের দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে বহুকালের আবশ্যিক; এজন্য তাঁহার জামাতা মনোহর কৰ্মকারকে উক্তকার্যে প্রবর্তিত করা হয়। এই যুবা এতৎকার্যে বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। মিসনারিগণ তৎপরে তাঁহাকে শ্রীরামপুরস্থ মুদ্রাযন্ত্রে একেবারে চত্বারিংশৎ বৎসরকাল নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুদ্রাঙ্করনির্মাণে মনোহর বাঙ্গালা, দেবনাগর, চীনে ও নানাবিধ মুদ্রাঙ্কর প্রস্তুত করণানন্তর বঙ্গদেশের বহুল মুদ্রাযন্ত্রে যোগাইয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বঙ্গদেশ একপ্রকার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছেন, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে ইউরোপের কেসলন বা ফিগিন্স অপেক্ষা অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ তিনি নিজ হস্তে বিবিধ ভাষার অক্ষরের ছেনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পারসী ও আরবী অক্ষরের ছেনী কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া নিবাসী রাধামোহন কৰ্মকার নামে এক ব্যক্তিতে প্রস্তুত করেন। বর্তমান অক্ষর তাঁহারই ছেনী হইতে প্রস্তুত। ঐ ব্যক্তির ৬০ কিম্বা ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। পারসীর তিন প্রকার ছাঁদ, যথা, মৌলবী আণ্ডাবুদী, এলাদাদী এবং মহানদী। তন্মধ্যে মহানন্দ ছাঁদ অধিকাংশ মনোনীত। মহানন্দ নামক একজন পণ্ডিতের হস্তলিখিত সুছাঁদ দৃষ্টে ইহার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য ইহা তাঁহারই নামে খ্যাত। উক্ত অক্ষরের ছেনী সংখ্যা ২৫০। আরবী অক্ষরও রাধামোহন নির্মাণ করিয়াছিলেন। আরবীয় ছেনী সংখ্যা দুইশত।

এদিকে যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগর মুদ্রাঙ্করের সৃষ্টি হইল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা পত্রেরও প্রচার আরম্ভ হইতে লাগিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম শ্রীরামপুরে মিসনারি মার্শমান সাহেব কর্তৃক “দিগদর্শন” নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও নানাবিধ সংবাদ প্রকটিত হইত। উক্ত বৎসরের ৩১এ মে তারিখে “সমাচারদর্পণ” নামে একখানি সংবাদপত্রও শ্রীরামপুরস্থ মিশনারিগণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। এইখানি বঙ্গদেশের আদি সংবাদপত্র। “সমাচারদর্পণ” বহির্গত হইবার কিছুকাল পরে “তিমির নাশক” নামক আর একখানি সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত। কৃষ্ণকুমার দাস নামে একজন এতদেশীয় ব্যক্তি উহার প্রচার করেন। ঐ পত্র স্বল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

কিয়ৎকাল পরে কলিকাতায় “সমাচার চন্দ্রিকার” প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত প্রাচীনতম সংবাদপত্র দেশের হিত সাধননোদেশে সকল বিষয়বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। স্বর্গীয় ভবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার জন্মদাতা। অধুনা বিদ্যালোচনা এবং সংবাদপত্রাদির এত উন্নতি হইয়াছে যে, পূর্বের সহিত এক্ষণকার অবস্থা তুলনা করিলে যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়।

সভাগণ! এক্ষণে আপনারা মুদ্রাযন্ত্রের কেমন উন্নতির অবস্থা দর্শন করিতেছেন। এক্ষণে আর তাদৃশ অসম্ভাবের কাল নেই। এক্ষণে মাসে মাসে, সপ্তাহে এবং দিনে দিনে কত শত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে ইংলন্ড হইতে আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্র, মসী, কাগজ, এবং মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিবিধ প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আসিতেছে। আমরা তদ্বারা আমাদের মুদ্রাঙ্কণ কার্য একপ্রকার সুচারুরূপে

৩০

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

১৯০৬ খ্রীঃাব্দে প্রকাশিত

সেই দেশে আমরা ছিলাম এবং আমরাই
ওগা বই আর্ট ২ পৃষ্ঠা ১৫৬

ইংলন্ডে কলে ছাপা ও কলে কম্পোজ পর্য্যন্ত প্রচার হইতে চলিল, কিন্তু আমাদের দেশে মুদ্রাঙ্করের অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার ও তদুপযুক্ত কেসেরও এপর্য্যন্ত সৃষ্টি হইল না। অনেকে চিন্তা করেন না ও জানেন না যে, পূর্বেও বিষয়দ্বয়ে কতদূর উন্নতি সাধন করা আবশ্যিক। যন্ত্রাধ্যক্ষেরা যদ্যপি এতৎ সম্বন্ধে দৃঢ়পরিকর না হয়েন তবে আর কে হইবে! বাঙ্গালা গ্রন্থকর্তাদিগেরও এতৎ সম্বন্ধে উদাস্য প্রকাশ করিলে চলিবে না; কারণ উভয় পক্ষের সংযোগ ব্যতিরেকে এই সুমহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন।

সভাগণ! আমাদের দেশের বর্তমান মুদ্রাঙ্কণের অবস্থায় কোন প্রকার গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে কিনা, আলোচনা করিয়া দেখুন। অধুনা যাঁহারা মাতৃভূমির উন্নতি করিয়া বিব্রত, তাঁহারা যদ্যপি কোন একদিন “ইংলিসম্যান” অথবা “ডেলিনিউস” নামক ইংরাজি পত্রিকাসদৃশ বৃহদাকারের প্রাত্যহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে আমার পূর্বেও বাক্যের সারবত্তা গ্রহণ করিতে পারিবেন। আমাদের দেশে টাকার অসম্ভাব নাই, লেখকেরও অসম্ভাব নাই, দৈনিক পত্রিকার যাহা কিছু প্রয়োজন তৎসমুদায়ের আয়োজন হইলেও কেবল বর্তমান মুদ্রাঙ্কর এবং কেসের বিশৃঙ্খলতা দোষে তৎসমুদায়ই বিফল হইবে। কারণ কেসের প্রত্যেক ঘরে অক্ষর রাখিবার কোন একমত্য নিয়মবদ্ধ প্রণালী না থাকা প্রযুক্ত সময় বিশেষে নিশাকালে অপর মুদ্রাযন্ত্রালয়স্থ অক্ষর সংযোজকগণ (compositor) দ্বারা উক্ত পত্রিকার কার্য্যনির্বাহ করিতে হইলে, কিরূপে নির্দিষ্ট প্রত্যয় সময়ে পত্রিকা প্রকাশিত হইবে? কারণ তাহারা নিশীথ সময়ে কোনদিকে ‘আক্ষর সাট’ কোনদিকে ‘আক্ষর সাট’, কোথায় স্ত, কোথায় প্র, কোথায় দর্, ইত্যাদি হাতড়াইতে থাকিবে, না শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে অক্ষর সংযোজন কার্য্য (compose) নির্বাহ হয় তাহাই করিবে? একে রাত্রিকাল, তাহাতে আবার এইরূপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাজ করিতে হইলে স্বভাবতঃ কিরূপ বিরক্তি জন্মে ও কত সময় আবশ্যিক করে তাহা ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ব্যপয়ে ও স্বল্পকাল মধ্যে অধিক কার্য্য সম্পন্ন করাই সংবাদপত্রের জীবন— শুদ্ধ সংবাদপত্রের কেন, সাধারণ মুদ্রাঙ্কণের বলিলেও হয়। কিন্তু পূর্বেও সুবিধা আমাদের বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের কোথায়? এতদ্বিষয়ে ইংরেজদিগের কি এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলবদ্ধ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। কি ইংলন্ডে, কি আমেরিকায়, কি ভারতবর্ষে, যেখানে ইংরাজি ভাষা প্রচলিত, সেই সেই স্থানেই একরূপ অক্ষরধারা ও একরূপ অক্ষর সংস্থাপন ধারা; সুতরাং কার্য্যসুলভ যতদূর হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত সুসার হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে সেরূপ কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করাতে যে কতদূর কার্য্যসৌকর্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়া রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সভাগণ! উপসংহারকালে আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, আপনারা যদ্যপি কাহারও স্বদেশানুরাগপ্রিয়তা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে যাহাতে বাঙ্গালা ‘কেস’ ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্করের উৎকর্ষ সাধন হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হউন। ইহাতে যে কেবল মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় উন্নতি সাধন হইবে এমত নহে, বাস্তবিক ইহার উপর আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

বাংলা হরফের তিন দশা

সুবীর রায়চৌধুরী

“ইংরেজীর দোষ আবশ্যিক অক্ষরের অভাব;
বাংলার দোষ অনাবশ্যিক অক্ষরের সদ্ভাব।”

বাংলা অক্ষরবাহুল্যের অভিযোগ মুদ্রণবিশারদেরাও করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার আদিযুগে বিদেশী কর্মকর্তাদের সাধ্য এ-বিষয়ে স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া অক্ষর-সংস্কার যৌথ প্রচেষ্টার ব্যাপার। এই কারণে ক্যালকাটা ত্রিশচিয়ান সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক জন মারডক বাংলা হরফ-সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি স্লোগান তোলেন, ‘আন্দোলন করো, আন্দোলন করো।’ তাঁর ধারণা, বাংলা শিশুরা যদি শোনে যে যুক্তাক্ষরগুলি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, তা হলে মুটের মাথায় বুড়ি-ভর্তি মিষ্টি দেখার মতোই তারা পুলকিত হয়ে উঠবে। তিনি যেভাবে যুক্তাক্ষর ভেঙ্গে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতে লাইনো হরফ পরিকল্পনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়:

বর্তমান রূপ	প্রস্তাবিত রূপ	বর্তমান রূপ	প্রস্তাবিত রূপ
চিক্ণ	চিক্ণ	অঙ্কার	অঙ্গার
শৃঙ্খলা	শৃঙ্খলা	মস্থন	মন্থন
যাজ্জা	যাচ্ঞা	কুণ্ঠিত	কুণ্ঠিত
চিন্তা	চিন্তা	বন্ধু	বনধু

মারডকের অভিযোগ বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ ছাড়াও তাঁকে একশ কুড়িটিরও বেশী যুক্তব্যঞ্জন শিখতে হয়েছে। এবং বহু যুক্তবর্ণের চেহারার এমন বিকৃতি ঘটেছে যে তাদের চেনাই যায় না। তার ওপর কোনোটা বসে ওপরে, কোনোটা নিচে, কোনো বা পাশে* তাছাড়া ‘ইন্টোডাকশন, টু দ্য বেঙ্গলি ল্যান্ডস্বেজ’-এর লেখক ড. য়েট্‌স্-এর সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে সব ফাউণ্টের যুক্ত ব্যঞ্জনের চেহারাও এক নয়। সব মিলিয়ে তাঁর মনে হয়েছে গ্রীক হরফ দশ বছর আগে যেরকম ছিল, বাংলা হরফও সেই যুগেই আছে। আগেকার যুগের গ্রীকের মতোই বাংলাতেও শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকত না, যতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না, যুক্তব্যঞ্জনের বাহুল্য ছিল। পরে শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন হয়, যতিচিহ্নের প্রচলন হয়— কিন্তু গ্রীক যুক্তাক্ষর বর্জন করলেও বাংলা করেনি। এই জটিলতার দরুন বাংলা হরফের আকারে বৈচিত্র্য আনা যায় না। তাঁর মতে, ব্যাপটি মিশনের বর্জাইস টাইপ স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন

*এই ত্রিস্তর বাংলা হরফ বিষয়ে ছাপাখানার অভিযোগ দীর্ঘকালের। বস্তুতঃ একই কারণে বাংলায় টাইপের ছড়াছড়ি। বাংলায় নির্ভুল ছাপা যে দুর্লভ ব্যাপার, তার অন্যতম কারণ এটি।

মর্ফদা থাকিতে কেনো নাজাহো ডাচয় আপন সদৃশ স্থানে ৬টি বৈস গিয়া ॥

হলেও বর্তমান (তৎকালীন) পরিস্থিতিতে পার্ল জাতীয় হরফ সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আরেকটি প্রস্তাব করেছিলেন, সিংহলি এবং তামিলের অনুকরণে বিরাম (হস) চিহ্নের ব্যবহার। কেননা বর্ণপরিচয় হবার পর তিনি ব্যঞ্জনগুলি স্বরান্ত এই নিয়মে 'বর্'-কে বর (অ) পড়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে ওটা 'বর্' হবে। সেই সাদৃশ্যে তিনি যখন 'তত'কে 'তৎ' পড়লেন, তখন জানলেন তা ভুল।

মারডকের চিঠির উত্তর বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে সম্ভবতঃ মারডকের সমালোচনার প্রভাবে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ষষ্ঠিতম সংস্করণে (১৮৭৫) বিদ্যাসাগর যোগ করেন: 'বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যেসকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারন্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে* এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল।' পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী মুদ্রণবিভাগও শব্দের আদিতে 'অ্যা' উচ্চারণ নির্দেশের জন্য মাঝের এ-কার চিহ্ন ব্যবহার করতেন। লাইনো ছাপায় অবশ্য তা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু 'সহ্য' এবং 'হ্যামলেট'-এর পার্থক্য বোঝাবার জন্য প্রথম ক্ষেত্রে 'হ্য' যুক্তব্যঞ্জন এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'হ' এবং 'য'-ফলা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এর কোনোটাই রীতি হয়ে দাঁড়ায়নি।

বাংলা যতিচিহ্নে কয়েকটি দৈন্য এখনও চোখে পড়ে। আজও বহু প্রেসে কোলনের বদলে বিসর্গ দিয়ে কাজ চালানো হয়। মারডকের বহু আগে ব্যাপটি মিশন প্রেসের সুপারিটেন্ডেন্ট পীয়ার্স কিছু কিছু সংস্কার প্রস্তাব করেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯-২০) লক্ষ করেন যে বাংলার নামবাচক বিশেষ্য, অথবা বাক্যের অংশবিশেষের ওপর গুরুত্ব দেবার কোনো উপায় নেই। তাঁদেরই অনুরোধে পীয়ার্স একটি নমুনা প্রকাশ করেন। শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছাপার হরফ' প্রবন্ধে তার প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। পীয়ার্স-এর প্রস্তাব ছিল ক্যাপিটল হরফের ক্ষেত্রে বাংলায় সোজা মাত্রা এবং অন্যত্র বাঁকা মাত্রা ব্যবহৃত হবে।

বাংলা হরফের এমনিতেই এত জটিলতা যে তার মধ্যে সোজা এবং বাঁকা মাত্রার সূক্ষ্ম তারতম্য চোখে পড়ত কিনা সন্দেহ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ত্রি-স্তরের বাংলা হরফ নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বৈপ্রবিক পরিবর্তন ঘটানো মুশকিল। তার ওপর আগে বলা হয়েছে লিপান্তর এবং ধ্বনি-সংবাদী বানানের প্রয়োজনে আরো অনেক বর্ণ ও ধ্বনিচিহ্নের প্রয়োজন হল। তার দৃষ্টান্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' (২য় সংস্করণ ১৯৩৭) থেকে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বাংলা স্বরের ধ্বনিও নির্দিষ্ট নয়। যেমন অ-স্বর স্থান বিশেষে অ, কখনো ও; এ কখনো এ, কখনো অ্যা। রফিকুল ইসলাম-এর ভাষায় 'এ কারণেই তো বাঙলা লিখন প্রণালী খাঁটি Alphabetic হতে পারল না অনেকাংশে Syllabic রইল।'

প্রত্যেক লিপির দুটো দিক আছে: চোখের এবং কানের। অনেক সময়েই লিপিগুলির সঙ্গে দেখা এবং শোনার সঙ্গতি হয় না। বলা বাহুল্য পুরোপুরি ধ্বনিভিত্তিক লিপিমাল্লা সব ভাষাতেই বিরল। আমাদের বৈয়াকরণেরা বিদ্যাসাগরের আমল থেকেই প্রধানতঃ যে চেষ্টা

সামদত্ত বলে সেনী নাকবিস গবর্ব !
আমার মহিমা জুত আমি জানি সব

এত সুান সোযদত্ত বোগোত্তে জাণল অগ্নির উপরে জেন হুত্ত চালি দিন ॥

করছিলেন তা হল বর্ণমালার বিন্যাসকে যুক্তিযুক্ত করা। সেজন্য দেখা যায় বাংলা অক্ষর পরিচয়ের খুব কম বইয়ের একটির সঙ্গে আরেকটির পুরো মিল আছে। বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণে 'ক্ষ' বর্জন করলেও রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন। কিন্তু এর দ্বারা ছাপাখানার কিছু এসে যায় না, কেননা 'ক্ষ' হরফটি কেউই বাদ দিচ্ছেন না। এ'রা কেউই বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের দৃশ্যরূপ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারে নয়। এ-জাতীয় পরীক্ষা-সমীক্ষায় যোগেশচন্দ্র রায় খুবই বৈপ্লবিক ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লাইনো-হরফ পরিকল্পনায় তাঁরও ভূমিকা ছিল। মারডক বিদেশী শিক্ষার্থী হিসাবে বাংলা বর্ণমালার যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন, যোগেশচন্দ্রের লেখাতে তার সমর্থন পাই:

১। এই (বাংলা) ভাষায় পনচাশৎ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পনচাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যিক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর।

২। অক্ষর-যোজনার দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক+া=কা; ক+িকি। ক+ী=কী, কিন্তু ক+ে=কে। আমরা বলি, ক+ে=কে; কিন্তু লিখি এ (ে) ক-কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। 'বন্দ' শব্দ 'বন্দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু 'বন্দে' শব্দ যদি 'বন্দে' লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে 'ে' যোগ করিতে হয় অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়।

যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা হরফের ত্রিস্তর তুলে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ইত্যাদি নিচে বসবে না অথবা রেফ ইত্যাদি ওপরে বসবে না— সবার স্থান পাশাপাশি। দ্বিতীয়তঃ ণিকার যেহেতু পরে উচ্চারিত হয়, সেজন্য তার স্থান হবে পরে। যুক্তাক্ষরের বাহুল্যও কমে যাবে। তাঁর মতে:

“নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্নের (শৃঙ্গ, পাতী, উৎকলা, বিন্দু, হস্ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষায় যাবতীয় শব্দ ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও ১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়।”

বন্দ্য মাত্ৰম্ ।
 গ্নাংজনাং গ্নফনাং মনমুজা-শীতলাং
 শাংফম্ - শ্ফ্যামলাং মাত্ৰম্ ॥
 শ্ৰম্ভহ জমুতোমনা-প্ৰমলকীন্ত-দ্রাম্মীনীং
 ম্ৰম্মনন - ক্রম্মম্মীত - দ্রম্মদন - শোভীনীং
 গ্নম্মাম্মীনীং গ্নম্মম্মম্ম ভাম্মীনীং
 গ্নম্মদাং বদ্যং মাত্ৰম্ ॥

কোন দোষে দোষী আমি কহত সত্তর
 এত কট ভাসা মোরে কহিস বর্ষর

এছাড়া তিনি বাংলা র-এর বদলে নাগরী 'র' চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন কলম না তুলে যে হরফ লেখা যায় সেটাই বৈজ্ঞানিক। তাঁর লিপি-সংস্কারের নমুনা: যোগেশচন্দ্র নবলিপি বাংলায় গৃহীত হয়নি। কিন্তু অনেকটা এই পথেই পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) 'সহজ বাঙলা'-র আন্দোলন হয়েছিল। এ-কারের ব্যাপারে দেখতে পাই সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর মতের মিল আছে।

“বঙ্গদেশের এক লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও সর্বজন-সমাদৃত লেখক— একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক ও আভিধানিক এবং রস-রচয়িতা— তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার হাতে কামাল পাশার মত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আইন করিয়া দেশে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি রোমান অক্ষর প্রচলন করাইতেন।”

আমাদের প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়, সব ভারতীয় ভাষার বেলাতেই রোমান পক্ষপাতী ছিলেন। ওপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজশেখর বসুও এ-ব্যাপারে কম উৎসাহী ছিলেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান যুক্তি ছিল এই:

১। “এখন বাঙ্গলা ছাপিতে গেলে প্রায় ৬০০ বিভিন্ন টাইপের দরকার হয়। ...আমি যে-ভাবে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিতে বলি... তাহাতে অনধিক চল্লিশটা অক্ষরেই সব কাজ চলিবে।”

২। “‘ক’, ‘খ’, ‘চ’— এইরূপ আকারের অক্ষরের বিশেষ কোনও মহাত্ম্য নাই; ইহাদের সঙ্গে কেবল ৮/৯ শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের যোগ আছে এইটুকু মাত্র। যদি প্রাচীনত্ব ধরিতে হয়, তাহা হইলে দেবনাগরী বা বাঙ্গলা ‘ক, খ, চ’ বর্জিত করিয়া ব্রাহ্মকেই গ্রহণ করিতে হয়।”

বস্তুতঃ বাংলা বর্ণমালার বদলে রোমান হরফের প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গত শতক থেকেই চলছে। এযুগেও বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই খুদা এর সমর্থক ছিলেন। শ্রীসুকুমার সেন রোমান বর্ণমালার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করলেও তাঁর ‘অ্যান ইটিমলজিকাল ডিক্সনারি ইন বেঙ্গলি (১৯৭১) রোমান হরফে মুদ্রিত। উক্ত অবিধানের টীকা-টিপ্পনী অবশ্য ইংরেজী ভাষায়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম বাংলা বই যে রোমান অক্ষরে ছাপা (‘কুপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ’, ১৭৪৩ খ্রী), সেটা অযৌক্তিক বলা যায় না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগেও রোমান হরফ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্ট-এর তত্ত্বাবধানে ষ্ট্রিপের গল্পের ছটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বইটি রোমান হরফে মুদ্রিত। গিলক্রাইস্ট অবশ্য ভূমিকায় জানিয়েছিলেন যে তারিখীচরণ মিত্র অনূদিত বাংলা অংশটি স্বতন্ত্রভাবে আবার বাংলা হরফে মুদ্রিত হবে। কিন্তু বাংলা হরফে মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান হরফে মুদ্রণের আরো কিছু খবর পাওয়া যাবে শ্রীপাছুর পূর্বেক্ত গ্রন্থে। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ প্রচলনের বিশেষ বিরোধী ছিলেন হোরেন্স

হেম্যান উইলসন। দেওয়ান রামকমল সেনকে লেখা একটি চিঠিতে (২০ অগাস্ট ১৮৩৪ খ্রী) তিনি মন্তব্য করেন:

“শ্রীযুক্ত সিডন্স দেবনাগরীর বদলে রোমান হরফ প্রচলনের একটি চমৎকার পরিকল্পনা আমাকে পাঠিয়েছেন— উৎকৃষ্ট ধ্বনিমালার বদলে নিকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা। এসব উদ্ভট পরিকল্পনার একটাই বড়ো সাস্থ্য হল এক অসম্ভাব্যতা। যা কোনোদিনই হবে না, তার প্রতিবাদ করাতেও শুধু সময় নষ্ট— আর এ ধারণা মৌলিকও নয়। গিলক্রাইস্টের শকুন্তলা, পরিপ্লট ফেব্‌ল্‌স ইত্যাদির অবস্থা দেখুন না। সেগুলো কে উল্টে-পাল্টে দেখে? ট্রেভেলিয়ান হচ্ছেন আরেকজন গিলক্রাইস্ট, হয়ত একটু বেশী শিক্ষিত, কিন্তু উদ্ভটত্বে সমান।”

কিন্তু উইলসন রোমান হরফ প্রচলনকে যতই উদ্ভট বলে মনে করুন, এ-আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে নানা সময়ে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসের একটি রোমান হরফে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলায় উর্দু হরফ প্রচলনেরও উদ্যোগ হয়েছিল একবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য আনার জন্য বাংলা লিপির বদলে উর্দু হরফ চালাবার চেষ্টা করেন তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার। কিন্তু ওখানকার বাংলাভাষীদের সমবেত আন্দোলনে তা ব্যর্থ হয়। তবে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত ‘পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি’ (যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুণীর চৌধুরী, আবদুল হাই প্রমুখ) তার সুপারিশে যে ‘সহজ বাংলার’র কথা বলেন, তাতে বাংলা লিপি বজায় রেখেও সংস্কারের প্রস্তাব ছিল এতে কিছু-কিছু যুক্তাক্ষর রেখে দেবার প্রস্তাব হলেও ধ্বনিসংবাদী বানানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন ঙ্গ, ক্ষ, থাকলেও বাহা, সহ্য লেখা হবে এইভাবে: বাজ্বা, সজ্বা। ভাষা কমিটি প্রস্তাব করেন বাংলায় স্বরবর্ণ হবে ছ’টি (অ আ ই উ এ ও) এবং প্রয়োজন হলে আরেকটি যোগ করা যেতে পারে অ্যা। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হবে একত্রিশ:

ক	খ	গ	ঘ	প	ফ	ব	ভ
চ	ছ	জ	ঝ	ন	ম	শ	ছ
ট	ঠ	ড	ঢ	র	ড়	য়	ল
ত	থ	দ	ধ	হ	ং		

প্রস্তাবিত বর্ণমালায় দুটি ‘ছ’ আছে, সম্ভবতঃ একটি স-এর কাজ করবে। কেননা ওপারের বাংলা একাডেমির লিপি-সংস্কার সমিতির প্রস্তাব ছিল দন্ত্য স ইংরেজী ‘এস’ এবং আরবী সম-ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হবে।

স্বরচিহ্নগুলির পরিবর্তনের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায়ের মতো ডান দিকে হ্রস্ব ই-কার দেবার কথা বলা হয়েছে। এ-কার চিহ্নেও ডান দিকে যাবে। ও-কার চিহ্নের বাঁ দিকের এ থাকবে না, শুধু টে-চিহ্নের ডান দিকের অংশটি থাকবে, যেমন কোন অর্থে কীন।

এই প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক এবং বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আসলে এ-জাতীয় লিপি-সংস্কার মূলত

কিং
বাংলাদেশ
মাধবী
মালতী
যুগী
জাতী
সেবতী

আঠারো শতকের হাতের লেখা

গোলাম মুরশিদ

যেসব পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়েছে, তা এখনকার পাঠকদের জন্যে কেবল দুর্বোধ্য নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা পড়তে পারা অসম্ভব ব্যাপার। আগের এবং পরের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ বুঝে পড়তে হয়। তখন কোনো মুদ্রিত আদর্শলিপি ছিলো না। বিদ্যা ছিলো গুরুমুখী। সে কারণে মুন্সিভেদে হাতের লেখার ধরনে বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা যায় না। বিশেষ করে সেকালে হাতের লেখার মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিলো, যা মুদ্রাদোষের মতো। যেমন, ত্ত, দ্দ, দ্ব ইত্যাদি যুক্তবর্ণের ওপরে অকারণে একটা রেফ দেওয়া। যেমন, প্র ও পুকে লেখা হতো মোটামুটি একইভাবে। নীচে যেমনটা দেখা যাবে।

প্র ক্রন্ত্রপ্র পুঞ্জাঙ্ক প্রাণ্ড

উপরে প্রথমে আছে প্র। দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ। পরের পুঞ্জনীয় প্রথম বর্ণটি পু। এখানে প্র এবং পু-এর মধ্যে লক্ষণযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। তবে শেষের শব্দের প্র একেবারে আলাদা। এবং এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

য-ফলা, ম-ফলার মধ্যে কোনো কোনো শব্দে (যেমন ঘোষস্য ঘোষন্ম চোখে পড়ার মতো পার্থক্য ছিলো না। পোষ্য-কে পোষ্ম এবং পোস্য লেখা হয়েছে। পরের শব্দটি কস্য। সব শেষে প্য।

প্রোষ্ম পোষ্ম পোস্য কস্য প্য

ন এবং ল-এর মধ্যে মিল এতোটাই যে, ন-কে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুত, উভয়ই লিখিত হতো একই বর্ণ দিয়ে। পার্থক্য বুঝতে হয় আগে-পরের বর্ণ থেকে। যেমন:

নস্য নালিশ নাক্ষ ফিননাস্য

প্রথম শব্দটি হলো: নকল। এখানে র এবং ল একই চেহারার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শব্দটি একই— নালিশ। এর মধ্যে প্রথম শব্দে সে এবং দ্বিতীয় শব্দে ষ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ন এবং ল— উভয় একই। চতুর্থ অবস্থানে আছে ফিল নাহয়। মূলে ছিলো: গাফিল নাহয়। পরপর ল এবং ন লেখা হয়েছে। তাদের আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই। আগের পরের শব্দ না পড়ে।

উ-কার খুবই গোলমালে ছিলো। একে একটা ফলার মতো মনে হতো। যে-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হতো, তার চেহারা আমূল বদলে গিয়ে সেটা যুক্তবর্ণের আকার ধারণ করতো। কু,

এক উদ্যান কবিয়া আপনি

স্বর্ণ ভূবায় কৈল অপূৰ্ণ ব্ৰহ্মণী ॥ ৬ ॥

এখানে প্রথম বর্ণটি যু, কিন্তু সেটি দেখতে হু-এর মতো। পরের শব্দটি শ্রীযুত। এই যু-এর সঙ্গে আজকের যু-এর কোনো মিলই নেই। সে জন্যে প্রথম দিকে পঞ্চগনন যে-বাংলা ফন্ট তৈরি করেছিলেন, তাতে যু-এর সেকালের বৈশিষ্ট্য বজায় ছিলো। পাঠক সে কারণে যু পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে পারেন।

কু, কৃ, ঙ্গ, ন্দ এবং ঙ্গ দেখতে কেবল খুবই কাছাকাছি। আলাদা করে দেখলে পার্থক্য বোঝা মুশকিল হবে। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে এটা বোঝা যাবে। সে জন্যে ইতিপূর্বে যাঁরা আঠারো শতকের পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রকাশ করেছেন, তখন আজ্ঞা না-লিখে আঙ্গা লিখেছেন। এর পেছনে আকৃতির সাদৃশ্য ছাড়া আর কোনো যুক্তি নেই।

কু কৃ ঙ্গ ন্দ আঙ্গা ঙ্গ

স্ত, শু, ঙ্গ, তু, ত্ত, জ্ঞ এবং ও দেখতে প্রায় একই। শব্দ থেকে বুঝে নিতে হয় আসলে বর্ণটি কী।

স্ত শু ঙ্গ তু ত্ত জ্ঞ ও

উপরের বর্ণগুলোর মধ্যে প্রথমটি স্ত, দ্বিতীয়টি শু, তৃতীয় শব্দের আদি বর্ণটি শু, চতুর্থ ও পঞ্চম শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ দুটি ত্ত, এবং শেষের শব্দের মধ্যম বর্ণটি ও। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি সামান্য আলাদা। অন্যগুলো একই চেহারার। জ এবং ত-ও দেখতে প্রায় একই রকম। ক বেশির ভাগ জায়গায় অদ্ভুত আকারের।

ত-এর সঙ্গে জ-এর সামান্য পার্থক্য ছিলো। চ এবং ঠ-কে আলাদা করে চেনার, উপায় কেবল পূর্বপরের পাঠ থেকে।

তহাছে ঠে ৪ ঠ

উপরের প্রথম শব্দ তাহাতেই। প্রথম ত-টি এখনকার মতোই। কিন্তু দ্বিতীয় ত-টি তখন বহুল প্রচলিত ছিলো। দ্বিতীয় শব্দ তঙ্কায় যেমন দেখা যায়। তৃতীয় স্থানে আছে জ। চতুর্থ শব্দের গোড়াতেও আছে জ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ত এবং জ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ ছিলো না।

স-ও একটি গোলমালে বর্ণ। অনেক জায়গায় না-জানা থাকলে একে চিনে নেওয়া সহজ নয়। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বক্তব্য বোঝা যাবে।

স সাঙ্ক্য সাঙ্ক্য সঙ্ক্য সঙ্ক্য

স্বপ্নানন্দ চ্যাপ্টে চার্লসবর্গে কৃত্যাদী বেণ্ডক নিম্নাবন মহাশয়

উপরের স-এর ছটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি অন্যগুলো থেকে একেবারে আলাদা। পরের তিনটিতে মিল আছে। শেষের দুটি ঢাকা অঞ্চলের তাঁতিদের লেখা। এই স-এর সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত স-এর মিল লক্ষ্য না-রে পারা যায় না। কিন্তু শেষের সন যেভাবে লেখা হয়েছে, সেটিই ছিলো বহুল প্রচলিত।

তখনকার বানানে অস্থিরতা দেখা যায়। এমন কি, একই মুঙ্গি একই শব্দ এক-এক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিখেছেন। কিন্তু যেসব শব্দে রেফ হওয়ার কথা সেসব শব্দে রেফ দিতে ভোলেননি। যেমন, কার্য। এ শব্দের এই বানান খুব একটা দেখা যায় না, যেমনটা দেখা যায় কাজ্জ্য। অথবা কাজ্জ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

কৃত্যাদী বেণ্ডক নিম্নাবন মহাশয়

প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দে মুঙ্গি ভুল জ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু য-ফলা এবং রেফ দিতে ভোলেননি। তৃতীয় চিত্রটিতে লেখা আছে কাজ্জ্য করিলাম। চতুর্থ ণ। যে-শব্দটির অংশ কেটে এই চিত্রটি তৈরি করেছি, সেটি পরের শব্দটি— পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ভুল বানান। শেষের টি র্দ। রেফের ব্যবহার এতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো যে, তা অনেক সময়ে মুদ্রাদোষের মতো মুঙ্গিদের পেয়ে বসেছিলো। তার ফলে যেসব জায়গায় রেফ হওয়ার কোনো কারণই নেই, সেসব জায়গাতেও মুঙ্গিরা রেফ লিখতেন। বিশেষ করে দ্বিত্ব বর্ণ হলেই তাঁরা কারণে-অকারণে একটা রেফ লাগাতেন। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে:

কৃত্যাদী বেণ্ডক নিম্নাবন মহাশয়

এখানে প্রথম চিত্রটি মধ্যে-র শেষ অংশ। অকারণে রেফ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় শব্দটি উত্তর। এ শব্দেও রেফ লাগানো হয়েছে। তৃতীয় শব্দটি নম্বরের। বলা বাহুল্য, এতেও রেফ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তার পরের শব্দটি তত্ত্ব [তত্ত্ব], এতেও অর্থহীন রেফ যুক্ত করা হয়েছে। 'এমত' শব্দে ত-এ অনাবশ্যক রেফ লাগানো হয়েছে। তারপরের শব্দটি— ভাগ্য— দেওয়া উচিত ছিলো গ্য। কিন্তু মুঙ্গি তার বদলে দিয়েছেন রেফ। তারপরের শব্দটি 'নিমিত্তক' অর্থাৎ নিমিত্তে (অধিকরণে ক)। কিন্তু এতেও ত্ত-এর উপর রেফ দেওয়া হয়েছে। সব শেষে আছে ন্দা। কিন্তু তাতেও অনাথত রেফ।

রেফের মতো র-ফলা দিলেও মূল বর্ণের লক্ষণীয় পরিবর্তন হতো। আগেই আমরা দেখেছি, পু এবং প্র কিভাবে একই রূপ নিয়েছে। আরও একবার সেটি দেখা নেওয়া যাক। সে সঙ্গে পত্র, ভাদ্র এবং গ্র।

কিছুদিনের মধ্যেই নিম্নোক্ত শব্দগুলি

অ ঙ ঞ ঠ

শেষের শব্দটি 'গ্রামের'। উপরের দৃষ্টান্তে ত এবং দ-এর কেবল রূপান্তর ঘটেনি। সেই সঙ্গে লক্ষ করা যায় যে, ত্র এবং দ্র— দুটি একেবারে একই চেহারা নিয়েছে। পুরো শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে না-দেখলে শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পাণ্ডুলিপি পড়ার সময়ে ঐ দলিলটিতে একই চেহারার বর্ণ কোথায় কোথায় আছে, তা দেখে নিতে হয়। তারপর একটি শব্দ পড়তে পারলে অন্য শব্দগুলো অনুমান করে নেওয়া সহজ হয়। সব সময়ে অর্থের কথাও মনে রাখতে হয়। উপরে ভাদ্র শব্দে যেভাবে ভ লেখা হয়েছে, তাতে ত-এর সঙ্গে কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু গোটা শব্দটি পড়লে এবং মূল দলিলের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে যে, এটি ভ লেখা হয়েছে, তাতে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে 'এ' অথবা 'ত' মনে করে নেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরো শব্দটির আলোকে এটিকে 'ভ' বলেই চেনা যায়।

তাক্ত

সেকালে ঋ-কারের বদলে অনেকেই র-ফলা লিখতেন। যেমন, নিচের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে, কৃপারামকে মুঙ্গি লিখেছেন ক্রপারাম। বৃক্ষকে লিখেছেন ব্রক্ষ।

হৃৎপারামামিবেব বৃক্ষে

প্রথম শব্দটি শ্রীকৃপারাম মিত্রের। দ্বিতীয়টি বৃক্ষ।

কৃপারাম মিত্রের শ্রী যেভাবে লেখা হয়েছে, তাতে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে থাকবে। কিন্তু শ্রীটি, এমন কি দীর্ঘ ঈটি চেনা শব্দ হয়ে পড়েছে। শ্রীর আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাকঃ

হা

স্বীকার করতে হবে যে, বৃক্ষের ক্ষও দুর্বোধ্য। কিন্তু শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কার করা ছাড়া, এটিকে চেনার আরও কোনো উপায় নেই। এ রকমের আরও দুটি বর্ণ হলো : ড এবং ঙ। উত্তম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

ড বৎ ঙ ঠ ঙ

এখানে প্রথম বর্ণটি ড, তারপরের বৎসর। তারপর ঠ। এবং সব শেষে ঙ। ল্প অথবা স্থ পড়াও প্রায় অসম্ভব।

মহিষ্ হাৎ

উপরের প্রথম শব্দটি হলো: মল্লিক। দ্বিতীয় শব্দটি স্থানে। জনা না-থাকলে তাদের পাঠোদ্ধার করা মোটেই সহজ হবে না। এখানে ক-ও কম শব্দ নয়। নিচে ক-এর আর একটি চিত্র দিচ্ছি— বাকী শব্দে।

বশ্য

এ রকমের আরও অনেক দুর্লভ দৃষ্টান্ত পাঠক এ বইয়ের দ্বিতীয় অংশের শতাধিক চিঠিপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ থেকেই দেখতে পাবেন। পাণ্ডুলিপি পাঠে আরও একটি বড়ো বাধা হলো তখনকার অদ্ভুত বানান। আমরা এখন যে-বানানে অভ্যস্ত, সে সময়ের রচনাতেও সেটাই প্রত্যাশা করি। তার ফলে আমরা যে-শব্দটি দেখতে পাই, সেটি চেনা হলেও অচেনা মনে হয়। কিন্তু এবারে আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি চিঠি এবং একটি নিয়োগপত্র পড়ে দেখবো। দুটি হাতের লেখা পড়াই তুলনামূলকভাবে সহজ। প্রথম দৃষ্টান্তটি অগাস্টিন অসাঁতের মুন্সির লেখা। সেকালের যেসব যেসব পাণ্ডুলিপি এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে সহজবোধ্য হাতের লেখা তাঁর।

পরগনে জাহানবাদ মোজেরামকৃষ্ণপুরের
 ইজাদার শ্রীরামহরি হালদারের আরজ
 নিবেদন আমাকে মহামহীম মহাসয়র পূর্ব আব ছিল জে তোমার ইজারায় লোকসান
 হইতেছে তাহা আমি মোন জোগ করিয়া জমায় কমি করিয়া দিব মাহসয় গরিব ইজাদার
 এটি ১৭৮০ সালের দিকে লেখা। এর পরের দৃষ্টান্তটি ১৭৯৬ সালের। এই মুন্সির হাতের লেখাও সুন্দর, যদিও একটু অলঙ্কৃত।

পরগনে জাহানবাদ মৌজে রামকৃষ্ণপুরেদর ইজাদার শ্রীরামহরি হালদারের আরজ নিবেদন আমাকে মহামহীম মহাসয়র পূর্ব আব ছিল জে তোমার ইজারায় লোকসান হইতেছে তাহা আমি মোন জোগ করিয়া জমায় কমি করিয়া দিব মাহসয় গরিব ইজাদার এটি ১৭৮০ সালের দিকে লেখা। এর পরের দৃষ্টান্তটি ১৭৯৬ সালের। এই মুন্সির হাতের লেখাও সুন্দর, যদিও একটু অলঙ্কৃত।

ফিরিস্তিকাগজ মোকাম ভাণ্ডারদহের কজ্জাদানের কিস্তীবন্দী মহাজন শ্রীযুক্ত মুসে
 বেরলে সাহেব মাং শ্রীবাজারি ফিরিস্তী সরকার শ্রীগদাধর দায সন ১১৯৭ (১৭৯৭) সাল
 নাং সন ১২০৩ সাল মাহ অগ্রহায়ণ পৌষ যুদ্ধা।

ফিরিস্তিকাগজ মোকাম ভাণ্ডারদহের কজ্জাদানের কিস্তীবন্দী মহাজন শ্রীযুক্ত মুসে বেরলে সাহেব মাং শ্রীবাজারি ফিরিস্তী সরকার শ্রীগদাধর দায সন ১১৯৭ (১৭৯৭) সাল নাং সন ১২০৩ সাল মাহ অগ্রহায়ণ পৌষ যুদ্ধা।

বিচিত্র ধরনের হাতের লেখা এবং কলমের কারণেও পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার কখনো কখনো কঠিন হয়ে পড়ে।

বইমেলায় বই

জঙ্গলগাথা ও রসনাবিলাস ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

শর্মিষ্ঠা বসু চিত্রিত ৫৫০ টাকা

সেই কবে দূর মহালের কাছারি থেকে আসা হাতিদের গলার ঘণ্টায় বেজে উঠত শরতের ছুটির ঠিকানা। রূপকথার খোঁজে বেরিয়ে পড়া স্বআরোপিত বীরব্রত পালনে। শরৎকালের শালজঙ্গল, ভাঙা আনন্দমঠের অবশেষ, সবুজ গাছালিতে ঢাকা গারো-জয়ন্তিয়া পাহাড়, গ্রীষ্মের বিহার ও ওড়িশার ছুলোয়া শিকার, অসমের ঘাসজঙ্গলে হাতিতে চড়ে শিকার, ভারতের সমস্ত বনবাংলোর বিশদ এমন সব টুকরো টুকরো নকশি মণিমাণিক্যে এই বই সেজে উঠেছে অবিশ্বাস্য আমেজী এক কলমের প্রভায়। অধুনালুপ্ত বৈঠকী রম্যতা যার মূলসূর।

অজানা উড়ন্ত বই রঞ্জন ঘোষালের রম্য প্রবন্ধ সংকলন

৬০০ টাকা

না-জনা ব্রহ্মাণ্ডের অজানাকে জানতে এবং গাঁজা-ভাঙ না খেয়েই যদি উড্ডীন হতে চাইলে আছে এই বইটি। আড্ডা-এয়ার্কির মানুষ রঞ্জন ঘোষাল। তার দোহারকিও কিছু কম সংখ্যার নয়। সুতরাং, বিশ্বতানে যে ধ্রুবপদটি বাঁধা আছে সেটিকে খুঁজে জীবনগানে গুঁজে দেবার বদখেয়ালের নামই অজানা উড়ন্ত বই।

কালচক্রযান মিহির সেনগুপ্ত

সৌমিক চক্রবর্তী চিত্রিত ৩৫০ টাকা (আত্মকথা)

নানা প্রশ্নে জর্জরিত যে প্রজন্ম নিজেই খুঁজে নিতে চেয়েছিল তার উত্তর, দেশভাগের হিংস্র ক্ষতস্থানের ওপর মুঠো মুঠো নুন উজাড় করে দেওয়া পঞ্চাশের দাঙ্গা, খাদ্য আন্দোলন পেরিয়ে নকশালবাড়ির আওনে পথে খুঁজেছিল মুক্তির দশক, কালচক্রযান সেই প্রজন্মের কথা। যে কাল শুধু পড়ে রয়েছে মিথ্যাভাস আর কল্পনার লুতাজালে আচ্ছন্ন হয়ে, অর্ধেক স্মৃতি আর বাকিটা এট্রিকক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে, তাকে প্রকাশে আনার এই সদর্প প্রচেষ্টা, এই অনবদ্য উন্মোচন।

অতঃপর অন্তঃপুরে সামরান হুদা

নমিতা চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫

শফিকুল কবীর চন্দন চিত্রিত ৪৫০ টাকা

বিস্মৃতির অবগাহনে চলে যাওয়া চরিত্রেরা, অন্তঃজ-গানে গল্পে বুনে চলেছে এক ভিন্নতর সাংস্কৃতিক বয়ান। হারানো হেঁশেলনামা। পাখি শিকার থেকে মাছ ধরার গল্প। এলোমেলো

মেয়েলিপাঠ। মাত্র বছর তিরিশ আগে কেটে যাওয়া সেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখা সময়ের জানালায়। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। স্বাদগুলি এখনও হারিয়ে যায়নি জিভের চোরাগলিতে। যে খণ্ড খণ্ড জলছবি ফুটে রয়েছে বই জুড়ে তা সিন্ধু। কখনও রসনায়, কদাচ কান্নায়। এই লেখা আসলে কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সময়ে খোঁজ করা অন্দরমহলের পাঁচালী। দেশান্তরী জীবনে নিভৃত অন্তঃপুরে বসে সামরান বুনলেন চিত্রল নকশা। খোঁজ করলেন অদৃশ্য এক সংস্কৃতির। হারানো বাংলাদেশের।

ঝরা সময়ের কথকতা হিরণ মিত্র

১০০০ টাকা

ধরাবাঁধা শিল্পকর্মে আটকে না থেকে ক্রমশ বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে গেছেন তিনি। খুঁজে বেড়িয়েছেন বাউল ফকিরদের পদচিহ্ন, নাটকের মহলাকক্ষে এঁকেছেন অভিনেতার চরিত্রে প্রবেশের সন্ধিক্ষণ, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে এঁকেছেন ঋত্বিক কুমার ঘটকের বর্ণমালা। কখনও আড্ডায়, কখনও নেশায়, কখনও আখড়ায়, কখনও তৃষ্ণায় তার তুলি কখনও শুকায়নি। কলমও নয়। সময়ের সংঘাতকে ধরার, মানুষকে চেনার বিচিত্র পদ্ধতি জন্মতে জন্মতেই তৈরি হয় ‘ঝরা সময়ের কথকতা’। সময়ের অখণ্ড ধারাবিবরণী আঁকা হয়েছে রামকিংকর বিনোদবিহারী থেকে হালের দেবশংকর হালদার পর্যন্ত।

কবিতা লিখতে ভয় করে বিপুল দাস

অরিদম মামা চিত্রিত ৩৫০ টাকা (আত্মকথা)

শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছিল যে অরণ্য তা উজাড় করে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে শহর। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধা নিয়ে বিপ্লবে বাঁপিয়ে পড়েছিল যেসব ছাত্র, ক্রমাগত বিশীর্ণ পাতার মতো তারা ভেসে গেছে কলস্বনা মহানন্দায়; সে নদীও এখন কালোজলের আবিল নর্দমা। মহানন্দার তীরে অবিনশ্বর ছাতিমের মতো এই বই, পুড়ে যাওয়া দেশকালের উপর ছড়িয়ে যাচ্ছে নতুন বীজ, লিলুয়া বাতাসে। বলে যাচ্ছে নবধারাপাতে নবাকুরসম রূপকথা। ফিনিক্সের উড়ানের মতো এই প্রোজ্জ্বল নকশা রচনা কেননা তার কবিতা লিখতে ভয় করে।

টুকিটাকী কুঞ্জাটিকা সীমা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণবেশ মাইতি চিত্রিত ৩৫০ টাকা

গাছেরা ক্রমাগত লিখেছে, নতুন পাতা কুড়ি ও ফল। নদী লিখেছে তার অগণিত উচ্ছ্বাস আর ঢেউ, জাল টপকানো মাছেদের গল্প, ইতিউতি জেগে ওঠা এইসব মাছরাঙা দ্বীপ। তবুও এই লেখা চরম হতশার, না খেয়ে চুরি করতে শেখার মতো সত্য আবিষ্কারের, উঠে যাওয়া মার্টিন কোম্পানির রেললাইন ডিঙানো নিষিদ্ধ জগত, কাদায় মোড়া সংসারে

দারিদ্র্যের দুই ফৌঁটা তাজমহল, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিনাশ, অজস্র মৃত্যুর ললাটে কুণ্ঠিত ব্যর্থতার কেশদাম। বিষণ্ণতার বিধুর রঙে রাঙানো এই লেখা এক একাকী বয়ে চলা নদীর, যাতে ভেসে যায় লখিন্দর আজও কলার মান্দাসে, মমতাময়ী মা তার উপর মশারি বিছিয়ে দিয়েছেন কেবল, টানটান।

আপন বাপন জীবন যাবন সন্নিং বসু

ভাস্কর হাজারিকা চিত্রিত ৩২৫ টাকা

বাঙালি রসিক, বাঙালি বড় কৌতুকপ্রিয়। আলি সাহেব থেকে রাধাপ্রসাদ আসর জমিয়েছেন এখানে, এনসিসি ক্যাম্পের “আত্মঘাতী বাঙালি” গোত্রের কঠোর সমালোচনা আত্মবিশ্বস্তের মতোই স্বধর্মে নিমজ্জিত। সুতরাং বেশুমার খেউড়-গল্পের উত্তর কলকাতা সমস্ত জরাজীর্ণ বলিরেখার গলিঘুঁজি নিয়ে উড্ডীন এই কেতাবি চর্চায়। এই প্রহসনমালা এক কথায় সুমনের গানের মতো, আমাদের প্রথম সব কিছু। এতে আছে হরতন রুইতনে সাজানো দেশ ও ক্যালিফোর্নিয়ার নাছোড় হোটেলগুচ্ছ। এই মহাগ্রন্থ ক্ষুধাতৃষ্ণনিবারক, বাঙালির কুঁড়েমির গাথায় নতুন সংযোজন। এই বই হাতে থাকলেই তীর্থ, পড়লে সাক্ষাৎ পরমার্থ।

এলাটিং বেলাটিং ১, ২

সম্পাদনা অরণি বসু, সামরান হুদা ৫০০ টাকা প্রতিটি

বালিকাবেলার নরম আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়ার নিরন্তর উজানযাত্রার গল্প এলাটিং বেলাটিং। স্ট্রীলিঙ্গের সচেতন সামাজিক নির্মাণ দুই খণ্ডের সুবৃহৎ সংকলনে। বাউলনীর কাঁথার মতো এই বই। দরবেশের আলখাল্লার মতো উদাসী এই বই আগাগোড়া সেলাই হয়েছে পুতুলখেলা, রান্নাবাটি, ফ্রক-ইজের, প্রথম স্কুলের দিন, প্রথম ঋতুকাল, প্রথম প্রেমের রেশমী কোমল সব টুকরো দিয়ে। মহামাতৃকুলের স্মৃতি নিয়ে লেখা এই বই ধারণ করে আছে অন্তত বছর সত্তর ব্যাপ্তির বালিকাবেলার সেই কোকুন, যার ভিতরে শিশুকন্যারা ক্রমাগত বদলে গিয়েছে তারুণ্যে।

ভাগফল ৭১ মেয়েদের কথা

সম্পাদনা বর্ণা বসু, কিশোর পারেখের আলোকচিত্র, প্রচ্ছদপট রঘু রাই ৪৫০ টাকা

জন্মসূত্রে নারী পরিযায়ী। গার্হস্থ্য জীবনে মানবাধিকারের অভাব মেয়েদের জীবনকে অহরহ পীড়া দেয়। শ্বশুরের ভিটেয় এমনিই সীমিত অধিকার; সেই স্থিতিশীলতাটুকুও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে রাষ্ট্রশক্তির তাড়নায়। দেশভাগ, স্বাধীনতায়ুদ্ধরাষ্ট্রবিপ্লবে মেয়েদের জীবনে নেমে আসে করাল ছায়া। তিরিশ লক্ষ শহীদ, চারলক্ষেরও বেশি ধর্ষিতা মেয়ের চোখের জলে মুক্তি কিনেছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বই কেবল সেই বিপুল বিজয়কে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র মুকুরে দেখার প্রচেষ্টা। যোলটি সাধারণ মেয়ের অসম্ভব জবানবন্দী।

জীবন-মৃত্যু ১, ২ অসীম রায়

সম্পাদনা রবিশংকর বল, কুশল রায় ৬০০ টাকা প্রতিটি

এ আশ্চর্য মায়ামুকুর, যাতে ধরা আছে স্বাধীনতাপূর্ব অখণ্ড বাংলা থেকে কম্যুনিষ্ট শাসনের পশ্চিমবঙ্গের চালচিত্র। এর শুরু একটি বালিকার শিশুকাল থেকে, এবং এই বইতে ধরা আছে তাঁর যৌবন, আশা, স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি। দেশ-কাল-সময়-সমাজ-সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ ও যুক্তির ধারালো স্ক্যালপেলে ফালি ফালি করে কেটে ছানবিন করেছেন অসীম রায়। বাদ দেননি নিজেকেও, অহং ও ষড়রিপুর রঙিন আবরণ সরিয়ে নিজেকে খড়মাটিতে দেখতে চাইবার এক অসম্ভব উপাখ্যান এই বই আত্মবীক্ষণের যন্ত্র এক। সুবৃহৎ দুই খণ্ডে অসীম রায়ের আত্মজীবনী ‘জীবন-মৃত্যু’, সম্পাদনা করেছেন একালের অবিসংবাদী কথাশিল্পী রবিশংকর বল। সঙ্গী অসীমপুত্র কুশল। বার বার ফিরে আসার এক সাড়ে তিনহাত তুমি এই মহাগ্রন্থ।

কামলাসুন্দরী

সম্পাদনা জয়িতা বাগচি, সুমেরু মুখোপাধ্যায় ৭৫০ টাকা

সে তো কবে থেকেই পুরাণ আর আর লোককথায় দেবীদের একাধিক হাত। তাই বাস্তব সংসারে উড়ে এসে জুড়ে বসে মাতৃবন্দনা, মানে কি না মেয়ে মানেই দেবী মানে এই দশভুজাটুজা গোত্র, যাকে টপ করে আজকালকার মডার্ন ফ্রেমওয়ার্কে ফেললে বলে দেওয়া যাবে মাল্টিটাস্কিং। মেয়েরা আজকাল আর ললিত লবঙ্গলতা নয় বলে দশটা পাঁচটার চাকরি ঠেলে ঘরে ফেরে। সুতরাং সকাল থেকে কাজের যাঁতায় পিষ্ট হওয়া, একই চাকরি করতে যাওয়া বরের মুখে খাবার ধরে হাঁচট খেতে খেতে বাসে চড়ে অফিস, সেখানে সহকর্মী কিস্বা উর্দ্ধতনের টিটকিরি কিস্বা লোভের দৃষ্টি উপেক্ষা করতে করতে কাজ, কাজের ফাঁকে বাচ্চার হোমওয়ার্ক আর বাড়িতে আটা ফুরিয়ে গেছে কি না ভাবতে ভাবতে মাঝে মধোই আয়নায় টুক করে দেখে নিতে হয় যে আদৌ দশটা হাত, যা গজালে সুবিধে হয়, তার কোনও পূর্বাভাস আছে কি না। নেই বলেই ছেলেমেয়ের ভাল মা, স্বামীর ভাল বউ, শ্বশুরগৃহে ভাল বউমা হয়ে ওঠা হয় না।

রসনাস্মৃতির বাসনাদেশ ১, ২

সম্পাদনা সামরান হুদা, দামু মুখোপাধ্যায় স্মারক রায় চিত্রিত ৬০০ টাকা প্রতিটি

বিজনে বিরলে ধীরে ধীরে জেগে থাকে প্রবঞ্চক মাঠ-ঘাট, শস্য-শ্যামল হাওয়া, একদা লাঞ্জিত ভিটেমাটি। দেশ বুঝি ডাক পাঠায়, পঞ্চদশ ব্যাঞ্জন সজ্জিত ভারতের থালা চলতে শুরু করে সপ্তপর্ণী কাছিমের ডাকে সাড়া দিতে। এভাবেই প্রাত্যহিক যাপনে উদ্বেল হয় উন্দাল-ভাবনা, বিস্মরণের কুয়াশায় বাতি জ্বালে ওদনসংস্কৃতির বাতিঘর। জোড়াতালি পড়েছে মাঠঘাটস্মৃতিপুকুরে। এক যে ছিল দেশ। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। এ

হল নতুন করে বুনতে চাওয়া ইতিহাসের তর্জমা, উদ্বাস্ত স্বপ্ন-স্মৃতি পুনর্বাসন প্রকল্পরসনাস্মৃতির বাসনাদেশ। এ আসলে ঘরে ফেরার গান। তাই এই সংকলন সকল খাদ্যরসিকের, এই সংকলন উদ্বাস্তদের, এই সংকলন বজ্রাদৃষ্ট নাবিকের যে হারিয়েছে দিশা।

উচ্ছনে যাওয়ার রাস্তায় সৌমিত দেব

স্বত্বান দাস, তারকাটা লেফ চিত্রিত ৩৫০ টাকা

কোনওরকম পারদর্শিতা, জ্ঞান, বোধ, ছাড়া, আশ্রয় জেতার চেপ্তার নাম কমেডি। তেমনই এই বইয়ে, বহুকাল ধরে জমা হাজার কষ্ট (যেমন চেহারা, অ্যাসিডিটি, কিছুতেই ক্রিকেট ভালবাসতে না পারা, দাড়ি না ওঠা, কবিতা লিখতে না পারা, সোজা উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, কেউই সিরিয়াসলি নিতে না চাওয়া, সবাই অংশখ্য প্রেমিকা আছে ভাবা সত্ত্বেও তিন বাল্যবন্ধুর সঙ্গে স্টার ওয়ার্স দেখে উইকেন্ড কাটানোর মত প্রগাঢ় সিঙ্গলহু, ইত্যাদি প্রভৃতি) সম্বল করে, দু-পাকেটে হাত আর দু-কানে হেডফোন গুঁজে চারপাশ দেখার কথা বলা হয়েছে ফলাও করে।

লটন মটন পায়রাগুলি সুচেতনা দত্ত

উপমা চক্রবর্তী চিত্রিত ৩২৫ টাকা

ছোটদের জন্য তো কত কিছু আছে। বড়দের জন্য আছেটা কী শুনি? কঠিন কঠিন গোমড়া প্রবন্ধ? আদিখ্যেতার একশেষ প্রেমের উপন্যাস? মাথায় না ঢোকা আধুনিক কবিতা? এটুকুই? বড়দের বুঝি ছোট হতে ইচ্ছে করে না? করেই তো! এদিকে ছোটবেলায় বড় হওয়ার বেজায় তাড়ার মধ্যেও সে বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছিল হরেক বিডন স্ট্রিট আর সিউড়ি, বেহালা আর বউবাজার, ময়ূরাস্কী নদীতে পালতোলা জাহাজ আর লোডশেডিংয়ের জলসা। জমিয়ে রাখা কড়ির ঝাঁপি উলটে ফেলা মাত্রই ঝাঁপা পড়ল দুই মলাটে। তৈরি হয়ে গেল ‘বড়দের জন্য ছোটদের বই’।

গোল্লাছুট কাশীনাথ ভট্টাচার্য

৬০০ টাকা

পায়ে পায়ে আনন্দ। এর ভাল নাম ফুটবল! সেই আনন্দই তাড়িয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা। ফুটবল কৌশলের বিশদ বিবরণ, সময় সারণি বেয়ে। হরেক লড়াই এর রূপকথা আর বুদ্ধির মার-প্যাঁচের অচেনা হাতের তালু আর পায়ের যাদু এবার এক মলাটে। এই বই খেলতে শেখায়, দেখতে শেখায়, পড়তে শেখায়। আনন্দের মাঝে বিবাদ আসে, জীবনের মতো। ক্ষমতার দস্ত থাকে, অক্ষমতারও। রাজনীতির কুটিল-করাল ছায়া ‘ঘনাইছে’ মাঠে মাঠে। তবু, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরও আরও আরও দাও ‘পাস’। ‘গোল্লাছুট’ আসলে একটা পাস।



কলকাতা বইমেলা
স্টল নম্বর ৪২৯

সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক
ময়ূখ ভবনের ২ নং গেট দিয়ে চুকেই সামনে

সারা বছর আমাদের বই পাওয়া যায় কলেজ স্ট্রিটের দেজ, দে বুক স্টোর দীপুদা, অভিযান, ধ্যানবিন্দু ও অন্যত্র। ভবানীপুর পোস্ট অফিস, গোলপার্কের ফাস্ট ফ্ল্যাশ, বাঘাযতীনের ক্যাফে কবীরা। বাংলাদেশে নোকতার বুবুক, বাতিঘর, পাঠক সমাবেশ ও অন্যত্র। ভারতে ঘরে বসে কিনতে পারবেন অ্যামাজন ডট ইন ও বইচই ডট কমে।

পাণ্ডুলিপি পাঠাতে ও নানান জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে দেখুন
www.lyriqalbooks.com

আগের বই

স্বাদ সধগয়িতা সামরান ছদা মাহবুবুর রহমান চিত্রিত ৫৫০ টাকা

খ্যাটন সঙ্গী দামু মুখোপাধ্যায় স্মারক রায় চিত্রিত ৫০০ টাকা

পাখালিনামা রূপঙ্কর সরকার ৪৫০ টাকা

রমণীয় দ্রোহকাল রঞ্জন রায় ৪০০ টাকা

আইটি আইটি পা পা যোষিতা ৪৫০ টাকা

বইচই আন্তর্জাতিক সম্মান ২০১৮ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ গদ্য

সুরের গুরু আলাউদ্দিন খাঁ শোভনা সেন সম্পাদনা অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ টাকা

সাত ঘাটের জল শঙ্খ কর ভৌমিক মুন্সায় দেব বর্মা চিত্রিত ২৫০ টাকা

আগামী প্রকাশনা

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর জীবন সর্দার শিল্প সত্যজিৎ রায়, যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

রণজিৎ সিংহ গদ্যসংগ্রহ খালেদ চৌধুরী চিত্রিত

চিকিৎসা সার্কাস গৌতম মিত্রি

একজীবন সুন্দরবন অভিজিৎ সেনগুপ্ত

ভালবাসি তাই জানাই গানে অরুণেন্দু দাস (আত্মজীবনী)

পায়ে চলার দিন সন্ধ্যা রায় সেনগুপ্ত

গড়গড়ার মা'লো পূর্ণা চৌধুরী

খাদের ধারে ঘর গার্বস্থ হিংসার গতিবিধি সংকলন

